মাথা

-- নাজিম মাহমুদ

পড়াশোনায় আমার বরাবরই অনাগ্রহ। দাদি বলতেন, আমার নাকি মাথা নেই। অর্থাৎ আমার বুদ্ধিহীনতার একটা ব্যাপার আছে। যাই হোক। আমি এই বুদ্ধিহীনতার কারণে বিভিন্ন সময়ে ছাতা হারিয়েছি। তার কয়েকটি ঘটনা এখানে বর্ণনা করছি।

প্রাইমারি লেভেলের ঘটনা। সম্ভবত ক্লাস থ্–তে পড়ি। তখন বর্ষাকাল। স্কুলের সময় হলো। খুব বৃষ্টি। আম্মা স্কুলে যেতে নিষেধ করলেন। কিন্তু আমার স্কুলে যাবার খুব আগ্রহ। তখন রোজ স্কুলে যেতাম। পড়াশোনা করি আর না করি রোজ স্কুলে যাওয়া চাই। শেষ পর্যন্ত আম্মা স্কুলে যেতে দিলেন। এবং সঙ্গে দিলেন একটি ছাতা। এখনো মনে পড়ে বড় সাইজের একটি ছাতা মাথায় স্কুলে গিয়েছিলাম।

স্কুল ছুটির পর গুড়ি গুড়ি বৃষ্টি হচ্ছিল। আমার হাতে ছাতা দেখে আমাদের এক স্যার বললেন তোর ছাতাটা আমাকে দে, এখন তো বৃষ্টি কম, তুই যেতে পারবি। কিন্তু বৃষ্টি বাড়লে আমার সমস্যা হবে। আমাকে অনেক দূরে যেতে হবে।

যাই হোক। স্যারকে ছাতা দিয়ে বাড়ি চলে এলাম। এক দিন যায়, দুই দিন যায় স্যার ছাতা ফেরত দিচ্ছেন না। স্বেচ্ছায় স্যারকে ছাতার কথা বলতে পারিনি।

আম্মা কয়েকদিন পর বৃষ্টির দিনে ছাতা না পেয়ে আমাকে বললেন, তুই সেদিন ছাতা বাড়িতে আনিসনি? চুপ করে আছি দেখে আম্মা বললেন, ছাতা কি করেছিস?

লজ্জায় স্যারের কথা বলতে পারিনি। মিথ্যা বলেছিলাম সেদিন। স্কুলে নিয়ে রেখেছিলাম আসার সময় দেখিনি। সেদিন আম্মা ও আব্বা আমাকে খুব বকছিলেন। এমন সময় দাদি এসে বলেছিলেন, থাক, আর বকতে হবে না। ভুল করে ফেলে এসেছে। এবং আমাকে কাছে টেনে মাথায় হাত দিয়ে বলেছিলেন ছেলেটার মাথায় কিছু নেই।

দ্বিতীয় ঘটনা। ক্লাস সেভেনে পড়ি। বর্ষাকাল। ছাতা নিয়ে স্কুলে গেলাম। টিফিনের সময় ব্যাগ ও ছাতা ক্লাসে রেখে মাঠে ফুটবল খেলতে নামলাম। খেলা শেষে ক্লাসে এসে দেখি ছাতা নেই। ছাতা নিল কে? তার তিন পা গজায়নি। ক্লাসের সবাইকে জিজ্ঞাসা করলাম। কেউই সঠিক জবাব দিতে পারেনি।

বাসায় এলে ছাতার কথা জিজ্ঞাসা করলে সঠিক জবাব দিতে না পারায় আব্বা বেত হাতে আমাকে মারতে এলেন।

কয়েকটি বাড়ি দেয়ার পর দাদি ছুটে এসে বললেন, ভুলে ফেলে এসেছে। আর মারার দরকার নেই।

সেদিনও দাদির কারণে ছাতা হারানোতে বেশি মার খেতে হয়নি। তা না হলে আরো বেশি মার খেতে হতো। কেননা ছাতাটি নতুন ছিল এবং দাম ছিল ২৫০ টাকা।

তৃতীয় ছাতা হারানোর কাহিনী হচ্ছে একটু ভিন্ন ধরনের। ইন্টারমেডিয়েট সেকেন্ড ইয়ারে পড়ি। ইতিমধ্যে বেশ কিছু বন্ধু জুটিয়েছি। ছোটরা কলোনিতে নিয়মিত আড্ডা দিই। তখন বর্ষা মরসুম ছিল। বিকেলে আনিস, শামীম, বাবলু, সুমন, মাহবুব, পারভেজ, টিটু আমরা আট নয়জন মিলে কলোনির ছাদে আড্ডা দিচ্ছি। বাবলু সব সময় সাইকেল নিয়ে আসতো। সন্ধ্যায় আড্ডা শেষে নিচে গিয়ে দেখি বাবলুর সাইকেল নেই। তখন দৌড়ে গেটে এসে দেখি বাবলুর সাইকেল ও একটা ছেলের সামনে আনিসের বড়ভাই দাড়িয়ে আছে। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন সাইকেলটা বাবলুর। সাইকেলটা নিয়ে চোর পালাচ্ছিল। তাই তিনি ধরেছিলেন চোরকে।

আমাদেরকে দেখে তিনি সব বললেন। সবাই মিলে চোরকে পেটানো শুরু হলো। আমি ছাতা দিয়ে দুই তিনটা বাড়ি দিতেই ছাতাটা মাঝ বরাবর ভেঙে গেল। তখনো ভাবনা এলো না যে ছাতা ভেঙে গেছে। ভাঙা ছাতা দিয়েই পেটালাম। পরে দেখি ছাতার কাপড় সম্পূর্ণ ছিড়ে গেছে। আমার ছাতা গেল। কিন্তু মনে ব্যথা পেলাম না। কারণ ভাবলাম, মহৎকর্ম করে ছাতা হারিয়েছি।

চতুর্থ ঘটনা। রেডিও-তে খবর শুনলাম ডিগ্রি পরীক্ষার ফল প্রকাশ হয়েছে। বাইরে প্রচণ্ড বৃষ্টি। ছাতা হাতে বৃষ্টি উপেক্ষা করে ফল জানতে গেলাম। রেজাল্ট আশানুরূপ হয়েছে। আনন্দে আত্মহারা। বন্ধুরা ধরলো মিষ্টি খাওয়াতে হবে। সবাই মিলে মিষ্টি খেতে গেলাম। মিষ্টি খেয়ে বিকেলে বাসায় মিষ্টি নিয়ে এলাম।

আমাকে দেখে আম্মা বললেন, রেজাল্ট কি?

বললাম।

পরক্ষণে আম্মা বললেন, কিরে, ভিজে এসেছিস কেন? ছাতা কোথায়।

তখন আমার টনক নড়লো। আরে ছাতা কোথায় ফেলে এসেছি! পরে মনে হলো, কলেজে ফেলে এসেছি। কারণ মিষ্টির দোকানে ছাতা নিয়ে যাইনি।

এবার আর ছাতার জন্য কেউ বকা দিল না। আর আমার দাদিমাও বেচে নেই যে, বলবে এতোদিনেও তোর মাথা হলো না।

কুমিল্লা থেকে

ত্রাণকর্তা

-- মুহম্মদ মকছুদ আলী

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার ফেলোশিপ নিয়ে ১৯৯৯ সালে ব্যাংককে গিয়েছিলাম এমএস করতে। সময়টা ছিল সেপ্টেম্বর মাস। এই সময়টা থাইল্যান্ডে বর্ষাকাল। তাই যখন-তখন বৃষ্টি নামে আবার আকাশ পরিষ্কার। সাধারণত সমুদ্রবেষ্টিত দেশগুলোতে ছয় মাস বর্ষাকাল এবং ছয় মাস গ্রীষ্মকাল থাকে।

ব্যাংককে গিয়ে প্রথমেই একটি ছাতা কিনলাম। এই ছাতাটি পুরো একটি বছর ছায়ার মতো সঙ্গী হয়েছিল। ব্যাংককে প্রায় প্রত্যেকটি বাড়িতে কুকুর পোষে। আমি যে ডরমিটরিতে থাকতাম তার পাশেই এক নিঃসঙ্গ ভদ্রমহিলা বাস করতেন। তার পাচটি পোষা কুকুর ছিল।

রাতের বেলা যখন ইউনিভার্সিটির কমপিউটার ল্যাব থেকে বের হতাম তখন পথে হাটতে হাটতে সাপ এবং কুকুরের ভয়েই বুক দুরু দুরু করতো। আমাদের দেশের মতো কখনো কোনো ছিনতাইকারীর সাক্ষাৎ পাইনি। আমরা প্রতিটি ছাত্রছাত্রী প্রতিদিন রাত বারোটা থেকে একটা পর্যন্ত কমপিউটারে কাজ করতাম। এমনি একদিন রাত বারোটার পর বাসায় ফিরছি। কাধে ব্যাগ, হাতে ছোট্ট ছাতাটি। ইউনিভার্সিটি থেকে বের হয়ে যখন প্রধান সড়কে এসেছি তখন দেখি রাস্তা একেবারে ফাকা। দুই একটি গাড়ি চলছে থেমে থেমে। কিন্তু রাস্তায় অসংখ্য কুকুর ঘোরাঘুরি করছে। মনে মনে আল্লাহর নাম নিতে থাকলাম। কারণ কয়েকদিন আগে আমার এক বাংলাদেশি সহপাঠিনীকে বাসার কাছে কুকুরে কামড়েছে। সেই থেকে তার হাসপাতালে দৌড়াদৌড়ি এবং ইনজেকশন নেয়া আমাকে ভীতির সঞ্চার করেছিল।

প্রধান সড়ক ধরে কিছু দূর এগোতেই দেখি তিনটি কুকুর আমার পাশ দিয়ে হেটে যাচ্ছে। কুকুরের দিকে নজর রাখছি। কারণ কুকুরগুলোর চাউনি খুবই বিপদজনক মনে হচ্ছিল। কুকুরগুলোর পাশ কাটিয়ে সামনে এগোতেই দেখি একটি কুকুর মাথা নিচু করে দ্রুত বেগে আমাকে কামড়াতে এগিয়ে আসছে। সমূহ বিপদ আচ করতে পেরে কি করবো বুঝতে পারছিলাম না, কিভাবে কুকুরের কামড় থেকে বাচা যায়। হাতের কাছে কোনো লাঠি বা ইট পেলাম না। অগত্যা কুকুরটি যখন একেবারে আমার পায়ের কাছে তখন কি যেন মনে করে হাতের মোড়ানো ছাতা দিয়ে মারলাম এক বাড়ি। কুকুর পিছুটান নিয়ে বিশ পচিশ হাত দূরে গিয়ে ঘেউ ঘেউ করতে থাকলো। ছাতা উচু করে ভয় দেখিয়ে আস্তে আস্তে সেই স্থান ত্যাগ করলাম। এবং মনে মনে ভাবলাম, এই ছোট্ট ছাতাটি আজ আমাকে নির্ঘাত কুকুরের হাত থেকে বাচিয়েছে।

সেপ্টেম্বর, ২০০০ সাল। এবার দেশে ফেরার পালা। স্ত্রী, পুত্র, কন্যা ও বন্ধু-বান্ধবের জন্য অনেক কেনাকাটা করলাম। লাগেজ গোছাতে গোছাতে ওজন বেশি হওয়ায় অনেক দরকারি জিনিসপত্র ফেলে এসেছিলাম। কিন্তু এক বছরের পুরনো ছাতাটি সঙ্গে করে এনেছিলাম। এখনো ছাতাটি রোদ বৃষ্টিতে

আমাকে রক্ষা করে। যদিও ছাতাটির একটি তার ভেঙে গেছে তবুও অতি বন্ধুর মতো অফিস, মার্কেটে সঙ্গে রাখি।

আজিমপুর, ঢাকা থেকে

রিকশাচালক

-- শারমিন লিমা

সেদিন সকাল থেকেই ঝমঝম করে বৃষ্টি হচ্ছিল। ঘুম থেকে উঠেই মেজাজ খারাপ হয়ে গেল। ক্লাসে যেতে পারবো না। কারণ এতো সকালে এমনিতেই রিকশা পেতে কষ্ট হয় তার উপর আবার বৃষ্টি। কোনো উপায় না দেখে চুপচাপ জানালার ধারে বসে বৃষ্টি দেখতে লাগলাম। কিন্তু এতেও শান্তি নেই। কারণ যতো বৃষ্টিই হোক না কেন, লেকচার ক্লাস ফাকি দিলেও ওয়ার্ড ফাকি দেয়ার কোনো উপায় নেই। কাজেই কোনোমতে রেডি হয়ে ওয়ার্ডের জন্য রওনা হলাম। স্বাভাবিকভাবেই রাস্তায় কোনো রিকশা নেই। আবার সামনে এগিয়ে যাবো তারও উপায় নেই। ছাতা নিয়ে আসিনি।

গত সপ্তাহে আমারই এক বান্ধবীর উপহার পাওয়া খুব পছন্দের এক ছাতা ওয়ার্ডে ব্যাগের মধ্য থেকে চুরি হয়ে গেছে। তাই ছাতা নেয়ার ঝমেলায় আর জড়ায়নি। এই অবস্থায় একটা দোকানের নিচে চুপচাপ দাড়িয়ে থাকলাম। এক মিনিট, দুই মিনিট করে দশ মিনিট পার হয়ে গেল। কোনো রিকশার দেখা নেই। মেজাজ আরো খারাপ হয়ে যাচ্ছে। হঠাৎ অনেক দূর থেকে একটা রিকশা আসতে দেখে মনে মনে আল্লাহকে ডাকতে লাগলাম। অন্তত এই রিকশাটা যেন পাই। কাছে আসতেই ভাড়া না বলে উঠে পড়লাম, রিকশাচালক চালাতে শুরু করলো। কিন্তু এটা আমার জন্য *গোদের ওপর বিষ ফোড়া*–র মতোই হলো।

জীবনে কোনো রিকশাচালককে এতো ধীরে রিকশা চালাতে দেখিনি। দুই তিনবার জোরে চালানোর তাগাদা দিয়েও কোনো লাভ হয়নি। রাগে নিজের চুল ছিড়তে ইচ্ছা করছিল। অথচ রিকশাচালক বেশ আয়েশি ভঙ্গিতে মাথায় ছাতা দিয়ে রিকশা চালাচ্ছে। ধমক দিতেও পারছি না। কারণ যদি বলে রিকশা থেকে নেমে যান। তাহলে তো আমার খবর হয়ে যাবে। আশপাশে কোনো রিকশার নাম–গন্ধও নেই। দাতে দাত চেপে শক্ত হয়ে বসে থাকলাম। অবশেষে রিকশা হাসপাতালের ইমার্জেন্সি গেটে পৌছালো।

এখানে এসেই আরেক বিপত্তি, দরজা এতো ছোট করে খোলা যে রিকশা ঢুকবে না এবং আমাকে বৃষ্টিতে ভিজে হেটে যেতে হবে। রাগ করে রিকশা থেকে নামতেই দেখি রিকশাচালক আমার মাথায়

ছাতা ধরলো এবং আমার সঙ্গে হাটতে শুরু করলো। আমাকে একটুও ভিজতে না দিয়ে গাড়ি বারান্দা পর্যন্ত পৌছে দিল। আতঙ্কে ভাবতেই পারছিলাম না কি হচ্ছে! কিন্তু যখন হুশ হলো তখন দেখলাম রিকশাচালক আমাকে পৌছে দিয়ে ভাড়া না নিয়েই চলে যাচ্ছে। এই অবস্থায় হাসপাতালের মধ্যে থেকে চিৎকার করে ডাকতেও পারছি না আবার বৃষ্টির জন্যে রাস্তায় নামতেও পারছি না।

ফ্যাল ফ্যাল করে চলে যাওয়া পথের দিকে তাকিয়ে থাকলাম। নিজেকে খুব ছোট আর স্বার্থপর মনে হতে লাগলো। সারা জীবনের জন্য একজন মহৎ মানুষের কাছে ঋণী হয়ে গেলাম।

আমার ঝুলিতে মহৎ মানুষের আরো একটা নিদর্শন রেখে গেল সেই রিকশাচালক।

রাজশাহী থেকে

বিন্দু বিন্দু

-- সঞ্জয় কুমার ভৌমিক

এক.

ছোটবেলায় ছাতা হারানোটা ছিল আমার রীতিমতো একটি অভ্যাস। একদিন স্কুলে গেলাম ছাতা নিয়ে। কিন্তু ফিরে এলাম ছাতা ছাড়া। মা যথারীতি বকাবকি শুরু করলেন এবং বললেন এক ঘণ্টার মধ্যে ছাতা হাজির করতে।

স্কুলে গেলাম। কিন্তু পেলাম না। ছাতা হারানোটা নাকি খুবই অমঙ্গল এবং ছাতা সত্যি যদি হারিয়ে যায় অর্থাৎ যদি আর পাওয়া না যায়। তাহলে আমাকে মা রামধোলাই দেবেন। ভয়ে চোখে পানির বন্যা শুরু হলো। হঠাৎ করে মনে হলো একটি দোকানে একটি জিনিস কিনেছিলাম। কিন্তু ছাতাটি সম্ভবত আর নেয়া হয়নি। সেই দোকানে গেলাম। দোকানি আমার ইন্টারভিউ নিলেন। পাস করলাম। ছাতা ফেরত পেলাম। মনে হয়েছিল যেন এক বিরাট বিপদ থেকে বাচলাম।

দুই.

একবার এক বিয়েতে গিয়েছিলাম। বিয়েটি ছিল আমার এক মামাতো বোনের। বেশ ধুমধাম করে বিয়ে হলো। উপহার সামগ্রী ভাগ বাটোয়ারা শুরু হলো। দেখা গেল, উপহারের মধ্যে বেশির ভাগই ছাতা। কারণ বিয়েটি হয়েছিল গ্রামে। এবং এখানে ছাতার ব্যবহার ছিল একটু বেশি। প্রায় দেড়শ থেকে দুইশ এর মতো ছাতা পাওয়া গিয়েছিল। আমি একটি ছাতা পেলাম সেখান থেকে।

তিন.

খুব বৃষ্টি হচ্ছিল সকাল থেকে। ছাতা মাথায় দিয়ে প্রাইভেট পড়ে আসছিলাম। হঠাৎ দেখি আমার পরিচিত এক মেয়ে। তার সঙ্গে কথা বলার ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও কথা বলতে পারছিলাম না। অবশেষে ভাবলাম এটাই সুযোগ। কাছে গেলাম, মেয়েটিকে ছাতাটি দিয়ে বললাম বাড়ি চলে যেতে।

মেয়েটি কিছু না বলে বাড়ি চলে গেল। ভাবলাম, থাক, বাসায় যাওয়া যাবে এখন। বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে নিজের বাসায় ফিরে গেলাম। পরের দিন মেয়েটির বাসায় গেলাম ছাতা আনতে। দরজা খুলে মেয়ের মায়ের ধমক খেলাম। মেয়েটিও না চেনার ভান করে এড়িয়ে গেল। মাঝখানে ছাতাটি হারালাম।

শ্রীমঙ্গল থেকে

ওপেন সিক্রেট

-- শামসুর রাহমান আকিক

ছোটবেলা বেশির ভাগ সময়ই নানুবাড়ি থাকাতাম। কারণ বাসায় আমার কোনো খেলার সঙ্গী ছিল না। তাছাড়া আমাদের বাসা থেকে নানুবাড়ির দূরত্ব ছিল মাত্র দশ মিনিটের পথ। প্রায় সময়ই নানুবাড়ি থেকে আমি আর আমার মামাতো ভাই জয় এক সঙ্গে স্কুলে আসা-যাওয়া করতাম।

বড় মামা আমাদেরকে তার বাইসাইকেলে করে স্কুলে নিয়ে যেতেন। স্কুল ছুটি হলে আমরা মামার দোকানে চলে আসতাম। সেখান থেকে সাইকেলে চড়ে নানু বাড়ি চলে যেতাম। তবে হাটের দিন আমাদের পায়ে হেটে বাড়ি ফিরতে হতো। কারণ হাটের দিন মামা দুপুরে বাড়ি আসতেন না। দুপুরের ভাত কাজের ছেলেকে দিয়ে পাঠিয়ে দেয়া হতো। বর্ষার দিনে রাস্তায় কাদা থাকার কারণে সাইকেল চলতো না। তাই পায়ে হেটে প্রায় দুই মাইল পথ পাড়ি দিয়ে স্কুলে যাওয়া লাগতো আমাদের।

ছোটবেলা আমরা দুজনই খুব দুষ্ট ছিলাম। হাতেগোনা কয়েকজন ছাড়া কাউকে তেমন ভয় পেতাম না। সঙ্গে মামা থাকতেন না। ইচ্ছা মতো দুষ্টমি করতে পারতাম রাস্তায়। চলতি পথে আমাদের বিভিন্ন রকম খেলার মধ্যে একটি ছিল ছাতা খেলা। আমাদের হাতের ছাতা দিয়ে একেক সময় একেক খেলায় মত্ত থাকতাম। তখন ছাতাটাকে আমরা মূলত খেলার সামগ্রী হিসেবে ব্যবহার করতাম।

প্রশস্ত রাস্তা থাকলে কি হবে। বর্ষার দিনে তা সরু হয়ে যেতো। একদিন বৃষ্টি না হলেই পথচারীদের পদচারণায় আকা বাকা সরু একটা পথ তৈরি হয়ে যেতো। এ যেন পা তাকে কাদামুক্ত রাখার তাগিদে নিজেই নিজের পথ তৈরি করে নিতো।

এ রকম সরু পথে দুইজন পাশাপাশি হাটা যেতো না। তাই সকলকে এক লাইনে হাটতে হতো। অপরপ্রান্ত থেকে কেউ এলে দাড়িয়ে থেকে জায়গা দিতে হতো। মাঝে মাঝে যেখানে পথ পড়তো না সেখান দিয়ে লাফ দিয়ে পার হতে হতো। আমাদের জন্য সেই ছোট লাফ দেয়াটা বিশাল মনে হতো।

প্রতিদিনের মতো সেদিনও আমরা সামনে–পেছনে হয়ে হাটছি। হঠাৎ জয় পেছন থেকে আমার দুই পায়ের মধ্যে ছাতা ঢুকিয়ে দিল টান। অমনি আমি ছিটকে কাদার মধ্যে পড়ে গেলাম। কাদা মাখা পোশাকে স্কুলে যাওয়া সম্ভব নয়। আর একজন স্কুলে না গেলে অন্যজনের যাওয়ারও প্রশ্নই ওঠে না। বাড়িতে এসে মিথ্যা অজুহাত দেখিয়ে পার পেলাম। এরপরের দিনই আমি এর প্রতিশোধ নিলাম তার মতো করেই। তবে ভাগ্য ভালো সে শুকনো জায়গায় পড়েছে।

এরপর থেকে দুইজনই সতর্ক হয়ে চলতাম যেন কেউ কাউকে ছাতা দিয়ে ল্যাং মারতে না পারে। এর জন্য দুজনই কাদার মধ্য দিয়ে হাটতাম। কারণ শুকনো পথে একজনকে সামনে থাকতে হবে। এবং সামনে থাকা মানেই বিপদ।

কাদা দিয়ে হাটতে গিয়ে আরেক সমস্যায় পড়তাম। মাঝে মধ্যে হঠাৎ করে কাদা মেশানো পানি পায়ের চাপে উপরের দিকে উঠে এসে হাফ প্যান্টের ফাক দিয়ে সোজা উরুর গোড়ায় গিয়ে আঘাত হানতো যাকে গ্রাম্য ভাষায় পিচকারী বলে। তখন যে কি অস্বস্তিকর লাগে তা কেবল ভুক্তভোগীরাই জানে।

যখন বর্ষা শুরু হতো তখন আমরা মত্ত থাকতাম কে কাকে ছাতার পানি দিয়ে ভেজাতে পারি। এবং কে কার ছাতা ফুটো করতে পারে। ফলে আমাদের মধ্যে ছাতায় ছাতায় যুদ্ধ শুরু হয়ে যেতো।

এভাবে কখন যে শৈশব পার হয়ে গেল বুঝতেই পারলাম না। আস্তে আস্তে আমাদের মধ্যে দুষ্টুমির প্রবণতা কমে যেতে লাগলো। এখন আর ছাতা নিয়ে আমাদের যুদ্ধ বা ল্যাং মারামারি হয় না। সেই কাচা রাস্তাটা এর মধ্যে পাকা হয়ে গেছে। আমরাও সাইকেল চালানো শিখে গিয়েছি। বৃষ্টির ফাকে ফাকে আমরা স্কুলে চলে আসতাম। তাছাড়া ছাতাটাকে তখন একটা বাড়তি ঝামেলা মনে হতো। সবচেয়ে বড় কথা, ছাতা ব্যবহার করতে বা হাতে নিয়ে হাটতে রুচিতে বাধতো।

এক সময় আমাদের জুটির বিচ্ছেদ ঘটলো। ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে চান্স পেয়ে জয় ভর্তি হলো। পারিবারিক কিছু সমস্যার কারণে আমি আর অনার্সে ভর্তি হতে পারলাম না। বাধ্য হয়ে মফস্বলের ডিগ্রি কলেজে ভর্তি হলাম।

এলাকার এক বড় ভাই ছাত্রনেতাকে ধরে এফ রহমান হলে একটা জায়গা করে নিল জয়। ঢাকা গেলেই সে হলে নিয়ে যেতে খুব পীড়াপীড়ি করতো। তাই এবার বাধ্য হয়ে এক রাত থাকার শর্তে রাজি হলাম।

জলির সঙ্গে আমাকে পরিচয় করিয়ে দেবে বলেছিল। জলির কথা এর আগে তার মুখে বহুবার শুনেছি। প্রথম দিকে তাদের সম্পর্কটা ছিল বন্ধুত্বের। এখন দুই জনই একে অপরকে নিয়ে স্বপ্ন দেখা শুরু করেছে।

বিকেল থেকে থেমে থেমে বৃষ্টি হচ্ছিল। আমরা যখন হল থেকে বের হচ্ছিলাম তখন জয়ের হাতে একটা ছাতা দেখে জিজ্ঞাসা করলাম, ছাতা বিদ্বেষী জয় আবার কবে থেকে ছাতা ব্যবহার শুরু করলো। আমাকে কিছু বলতে গিয়ে না বলে মুচকি হেসে রুমে তালা লাগাতে সে ব্যস্ত হয়ে পড়লো।

রোকেয়া হলের সামনে জলির সঙ্গে আড্ডাটা বেশ জমে উঠেছিল। কিছু বৃষ্টি আমাদের মধ্যে বাধা হয়ে দাড়ালো। অগত্যা আমাদের কাছ থেকে জলি বিদায় নিয়ে চলে গেল। বৃষ্টির মধ্যে আমরা দুইজন ছাতার নিচে দাড়িয়ে রিকশার অপেক্ষায় এদিক-সেদিক তাকাচ্ছি। হঠাৎ আমার চোখ এক জায়গায় স্থির হয়ে গেল। আমাদের কাছ থেকে বেশ কিছুটা দূরে এক জোড়া কপোত-কপোতী একটা ছাতার নিচে দাড়িয়ে অন্তরঙ্গভাবে একজন আরেকজনকে চুমু খাচ্ছে। ছেলেটার এক হাতে ছাতা ধরা অন্য হাত দিয়ে অসমতল ভূমিকে সমতল করার আপ্রাণ চেষ্টা চালাচ্ছে।

জয়কে ব্যাপারটা দেখালে সে বললো, এটা এখানে ওপেন সিক্রেট ব্যাপার। এটাকে তুই *ওরাল সেক্স* বলতে পারিস।

জয়কে প্রশ্ন করলাম, তাহলে তুই ছাতা ব্যবহার শুরু করেছিস *ওরাল সেক্স* কায়েম করার জন্য?

সে আমার কথায় কোনো উত্তর না দিয়ে একটা খালি রিকশা থামিয়ে আমাকে চড়তে বলে নিজেই আগে বসে পড়লো।

রিকশায় বসে ছাতাটার দিকে তাকিয়ে অবচেতন মনে বলতে লাগলাম, হায়রে ছাতা, তোর জন্ম হয়েছে কিসের জন্য আর তুই ব্যবহার হচ্ছিস কি কাজে।

মেহেন্দিগঞ্জ, বরিশাল থেকে

চোর

-- মহিউদ্দীন জুয়েল

জন্মদিনে এক বন্ধুর কাছ থেকে একটি ছাতা উপহার পেয়েছিলাম। ছাতাটি দেখতে খারাপ ছিল না। লালের ওপর সবুজ মানচিত্র। যে বন্ধুটি আমাকে ছাতাটি উপহার দিয়েছিল সে বিদেশ থাকতো।

বিদেশ থেকেই এনেছিল ছাতাটি। রাস্তায় যখন ছাতাটি নিয়ে বের হতাম তখন সবাই অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকতো। কেউ কেউ আবার ছাতার দিকে তাকিয়ে থেকে বলতো, বাহ্, বেশ সুন্দর তো! বিদেশি নাকি? ছাতাটিকে নিয়ে আমার ছিল এ রকম গর্ব।

বর্ষার সময়ে একদিন ছাতাটিকে নিয়ে ইউনিভার্সিটিতে গেলাম। ক্লাস শেষ করে যখন বাসায় ফিরছি তখন পেছন দিক হতে কে যেন ডাক দিল। এই যে শুনছেন?

পেছন ফিরে দেখলাম লাইব্রেরির বারান্দা থেকে একটা মেয়ে ডাকছে। কাছে গেলাম। বললাম, আমাকে বলছেন?

মেয়েটি বললো, জি, আপনাকে। যদি কিছু মনে না করেন তাহলে আমাকে একটু পৌছে দিন না। কাছেই আমার বাসা।

আমার মনের ভেতর তখন একটা আনন্দের বাতাস দোলা খেতে লাগলো। কেননা মেয়েটির চেহারা ছিল আমার প্রিয় নায়িকা ঐশ্বরিয়ার মতো। মেয়েটির মাঝে ঐশ্বরিয়াকে খুজে পেলাম। মেয়েটির কথা, তার চোখ, ঠোঁট, ভ্রু, স্তন, বাহু সব। জোরে বৃষ্টি শুরু হলো। মেয়েটিকে বললাম, চলুন।

মেয়েটি আমার ছাতার নিচে ঢুকে পড়লো। একটু যেতে না যেতেই বৃষ্টি তার শক্তি আরো বাড়িয়ে দিল। মেয়েটি অজান্তে আমার বাম হাতের ভেতর তার ডান হাত ঢুকিয়ে জোরে শক্ত করে ধরে হাটতে লাগলো। মেয়েটির হাতের স্পর্শে আমার শরীর রোমাঞ্চিত হয়ে উঠতে লাগলো। রক্ত সঞ্চালন দ্রুত বেড়ে যেতে লাগলো। বৃষ্টির পানির কয়েক ফোটায় তার গলা থেকে মুখ ভিজে যেতে লাগলো।

মেয়েটির দিকে তাকালাম। দেখলাম, তার বুক পুরোটা ভিজে গেছে। তার স্তন দুটি ভিজে জামার সঙ্গে লেগে আছে। তার গলা থেকে ঘাম নিচে যাচ্ছে। আমি বিমোহিত হতে লাগলো। তার ঠোঁট দুটো ভিজে যাওয়াতে লিপস্টিক অনেকটা মুছে গেছে। মেয়েটি তার ওড়না মাথায় দিল। সালোয়ার-কামিজ পরা মেয়েটিকে আমার আপন মনে হতে লাগলো। বলতে ইচ্ছে করলো, সৃষ্টির অপরূপ সেরা সুন্দর তুমি। কিন্তু বলতে পারলাম না। হাটতে হাটতে আমার মনে হচ্ছিল, এ পথ যদি শেষ না হতো! মেয়েটির অপরূপ গায়ের রঙ আমার প্রিয় মনে হতে লাগলো।

হাটতে হাটতে মেয়েটি তার পরিচয় জানালো। তার নাম কেয়া। দর্শন বিভাগের সেকেন্ড ইয়ারের ছাত্রী। থাকে মামার বাসায়।

এক সময় আমরা তার মামার বাসার সামনে উপস্থিত হলাম। তখন বৃষ্টি কিছুটা কমে গেছে। কিন্তু পুরোপুরি কমেনি। একটা বাড়ি দেখিয়ে মেয়েটি বললো, এই যে মামার বাসা। আর যেতে হবে না। আমাকে বললো, যদি কিছু মনে না করেন তাহলে একটা কথা বলতে পারি?

ভদ্রতার সঙ্গে বললাম, অবশ্যই।

সে বললো, আপনার ছাতাটা খুব সুন্দর, আমাকে একটু দেবেন। মামাকে বলবো এ রকম একটা ছাতা আমার খুব পছন্দ।

মেয়েটির দিকে ছাতাটা বাড়িয়ে দিয়ে বললাম, না, না অসুবিধা কি, নিয়ে যান। আমি আগামীকাল আপনার কাছ থেকে নিয়ে নেবো। যে জায়গা থেকে আপনাকে নিয়েছিলাম সেখান থেকে।

পরদিন খুব আগ্রহ আর আশা নিয়ে অপেক্ষা করছি মেয়েটির জন্য। লাইব্রেরির বারান্দায় বসে অপেক্ষা করতে করতে এক সময় অধৈর্য হয়ে ঘড়ির দিকে তাকালাম। দেখলাম বেলা দুটো। কিন্তু মেয়েটির কোনো খবর নেই। এর পরদিন আবার অপেক্ষা করতে লাগলাম। তারপরও মেয়েটির কোনো খবর নেই। এভাবে এক সপ্তাহ অপেক্ষা করলাম তার কোনো দেখা পেলাম না।

শেষে মেয়েটির ডিপার্টমেন্টে খবর নিলাম। কিন্তু সেখানেও পেলাম না। কারণ কেয়া নামের কোনো মেয়ে ওই ডিপার্টমেন্টে নেই। এভাবে পুরো দর্শন বিভাগ খুজলাম। সেখানে যে মেয়েরা ছিল তাদের সঙ্গে তার কোনো মিল খুজে পেলাম না, বিশেষ করে চেহারার দিক দিয়ে। ভাবলাম হয়তো অসুখ করেছে। তাই আসতে পারছে না কিংবা কেয়া নামের মেয়েটিকে তাদের ডিপার্টমেন্টে হয়তো অন্য নামে চিনে। এসব ভেবে মেয়েটির বাড়িতে গেলাম। তবে মেয়েটি যে বাড়িটি তার নিজের মামার বাসা বলেছিল সে বাড়িতে গিয়ে আমি তো অবাক! কারণ সেখানে কোনো মেয়েই থাকে না। যারা থাকে তারা সবাই ছাত্র।

ভাবলাম হয়তো এ বাড়ির মালিকের ভাগ্নি হবে। তাই ঠিকানা এ বাড়ির দিয়েছে। যখন এ বাড়ির মালিককে বললাম, আপনার ভাগ্নি আমার ছাতাটি নিয়েছিল, সেটা নিতে এসেছি।

তখন মালিক তো হেসে খুন। এবং আমাকে বাটপার ভেবে সন্দেহ করতে লাগলো।

আমি যখন আমার পরিচয় দিলাম তখন বাড়ির মালিক বললো, আরে ভাই, আমার তো কোনো বোনই নেই। ভাগ্নি আসবে কোথা থেকে?

আমি যেন আকাশ থেকে পড়লাম। বলে কি! তাহলে আমার ছাতা চুরি গেছে! জীবনে প্রথম ভালোলাগা আমার স্বপ্নের নায়িকা *ছাতা চোর।* ভাবতে পারছিলাম না। তখন শুধু একটা কথা বার বার মনে হচ্ছিল কেন সেদিন মেয়েটিকে পৌছে দিতে গেলাম। বন্ধুর দেয়া উপহার শেষ রক্ষা করতে পারলাম না। কারণ আমাকে যে বন্ধু ছাতাটি দিয়েছিল সে মারা গেছে ক্যান্সারে। বন্ধুর দেয়া উপহার রক্ষা করতে না পেরে নিজেকে আজ খুব অপরাধী মনে হচ্ছে। তবে একটা প্রশ্ন, আমি আজো মনের

গহীনে লুকিয়ে রেখেছি যেদিন কেয়া নামের মেয়েটির দেখা পাবো সেদিন তাকে প্রশ্নটা করবো তার মুখোমুখি হয়ে, কি কারণে সে ছাতা চুরি করতে গেল?

চট্টগ্রাম ইউনিভার্সিটি থেকে

টি বাধ

-- মেহজাবিন রহমান

এসএসসি–তে ভালো রেজাল্ট করলাম। তিনটিতে লেটারসহ ফার্স্ট ডিভিশন। এ জন্য আব্বা খুশি হয়ে ভর্তি করালেন রাজশাহী নিউ গভর্নমেন্ট ডিগ্রি কলেজে। কিন্তু আমাদের গ্রামেই ছিল এক ভালো ছাত্র। সে ক্লাস ফাইভে ভর্তি হয় নানাদের বাড়ি থেকে এসে আমাদের গ্রামের প্রাইমারিতে। তখন থেকেই সে আমার প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে ওঠে। দুজনের মধ্যে একবার আমি অন্যবার সে প্রথম হতো ক্লাসে। এসএসসি–তে সেও একটি লেটারসহ ফার্স্ট ডিভিশন পেল। নিউ ডিগ্রি কলেজে চান্স না পেয়ে ভর্তি হলো সিটি কলেজে।

দুজনে দু কলেজে পড়লেও গণিত ও পদার্থের প্রাইভেট পড়তাম একই টিচারের কাছে। কিন্তু দুজনে একে অন্যের সঙ্গে খুব কমই কথা হতো প্রয়োজন ছাড়া। সে থাকতো স্যারের বাসার অল্প দূরে। আমার হস্টেল ছিল বেশ দূরে। ফলে সে পায়ে হেটে এলেও আমাকে আসতে হতো রিকশায়। পড়া শেষে প্রয়োজনীয় দুই একটা কথা বলে সে চলে যেতো আমি আবার রিকশায় চড়ে চলে যেতাম।

বর্ষাকালে নিয়মিত দিনের পড়া শেষে সে বললো, চলো আজ পদ্মার *টি বাধে* যাই। আমিও এ রকম সুযোগের অপেক্ষায় ছিলাম। পদ্মার দুই কূল ছেপে পানি। শুকনো মরসুমে এখানে হাটুজল থাকে তা দেখে বোঝাই যাচ্ছে না। দুজনে হাটতে হাটতে একেবারে বাধের শেষ প্রান্তে চলে গেলাম। সন্ধ্যা ঘনিয়ে এলো। দেখলাম সূর্যাস্তের অপরূপ মহিমা।

এমন সময় সে আমার হাতে হাত রেখে বললো, মাহি! তোমাকে একটা কথা বলবো। অনেক দিন বলা হয়নি।

বললাম, বলো।

সে বললো, মাহি, আমি তোমাকে ভালোবাসি।

আনন্দে আমার দুচোখ বেয়ে অশ্রু এলো। কেননা আমি কতো শত চেষ্টা করেও তাকে এ কথা বলতে পারিনি। তার হাতটা শক্ত করে ধরে বললাম, রহমান, আমিও তোমাকে প্রাণের চেয়ে বেশি ভালোবাসি।

সূর্য ডোবার জন্য অন্ধকার হয়ে আসছে ভাবলাম। কিন্তু আকাশের দিকে চেয়ে দেখলাম। আকাশ কালো মেঘে ঢাকা। ফেরার প্রস্তুতি নিতে নিতেই মুষলধারে বৃষ্টি নেমে এলো। তার কাছে ছাতা ছিল না। আমার ছাতাতেই দুজনে শেয়ার করলাম। বৃষ্টি এতো জোরে হচ্ছিল যে, দুজনেই ভিজে গেলাম। ছোট ছাতাটা কাউকে বাচাতে পারলো না। এ অবস্থায় রোডের পাশে এসেও কোনো রিকশা পেলাম না। ফলে আরো হাটতে হলো। কিছুক্ষণ পরে একটা রিকশায় উঠে দুজনে একই পলিথিনে পা–গুলো ঢেকে রিকশার হুড তুলে এবং ছাতা মেলে বসলাম। আমাকে ভেজা শরীরে হস্টেলে পৌছে দিয়ে রহমান চলে গেল তার মেসে।

পরবর্তী কয়দিন একে অন্যের সঙ্গে ঠিকমতো কথা বলতে পারিনি। তারপর সব ঠিকঠাক দুজনের মধ্যে চলতে থাকলো। আমরা নিয়মিত একে অপরকে সময় দিতাম। এভাবে এইচএসসি পাস করার পর সে ভর্তি হলো রাজশাহী ইউনিভার্সিটিতে এবং আমি দুবার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়ে রাজশাহী কলেজেই অনার্সে ভর্তি হলাম।

আমাদের প্রেমের খবরটা দুজনার পরিবারেই জেনে গিয়েছিল। কেউ কারো জন্য বাধা হয়ে দাড়ায়নি। রহমানের মাস্টার্স পরীক্ষা শেষে তার দুলাভাইয়ের মাধ্যমে বিয়ের প্রস্তাব পাঠালো আমাদের বাড়িতে। সম্ভবত আমাদের দুই পরিবারের মধ্যে ব্যবধান ছিল না তেমন। তাই আমার আব্বা রাজি হয়ে গেলেন। যথাসময়েই বিয়ে হয়ে গেল আমাদের।

এখন আমরা দুজনে একই প্রতিষ্ঠানে চাকরি করি। এবং বসবাস করি একই ছাতার নিচে। যদিও এই ছাতাটা সে টি বাধের বৃষ্টি ভেজা দিনের মতো আটটি শিক ও কাপড়ের তৈরি নয়, এটি ইট, সিমেন্ট ও বালির তৈরি একটা পাকা ঘর আর এখানে হাজারো বৃষ্টিতেও ভিজে যায় না তবুও বার বার মনে পড়ে ওই ছাতাটির কথা যা থাকা সত্ত্বেও আমরা দুজনেই ভিজতে ভিজতে ফিরে ছিলাম পদ্মা নদীর টি বাধ থেকে। এটা এখনো আমাদের দাম্পত্য জীবনে ভালোবাসার উজ্জীবনী শক্তি হয়ে আছে।

ভোলারহাট, চাপাইনবাবগঞ্জ থেকে

ইনোসেন্ট

- - ফজলে রহমান লোপা

সেপ্টেম্বর ১৯৮৭ সাল। রাজশাহী ইউনিভার্সিটিতে ফার্স্ট ইয়ার। রাজনৈতিক সহিংসতায় হল ত্যাগের নির্দেশ। ইউনিভার্সিটির গাড়িতে করে নাটোর পৌছালাম। রাত আটটা। হালকা বৃষ্টি। গত সপ্তাহে

কেনা ফোল্ডিং ছাতাটা ডান বগলে, হাতে ব্যাগ, দৌড়। স্টেশনে ছাত্রছাত্রীদের তিল ধরা ধারনের জায়গা নেই। এগোচ্ছি ভিড়ের মধ্যে। হঠাৎ পেছন থেকে ফ্রেন্ড...।

পেছন ঘুরতেই প–র–প–র শব্দ, বগল থেকে ছাতাটা সরে গেলে ঘুরে তাকাতেই আমি স্ট্যাচু। মেয়েটা ছাতা মাথায় দাড়িয়ে, আমার ছাতাটা তার ডান হাতের নিচ দিয়ে জামা ছিড়ে গোলাপি ব্রা–র সঙ্গে ঝুলছে।

লাজুক হওয়ায় মেয়েদের সঙ্গে মেলামেশা ছিল না, তাছাড়া মেয়ে মানুষ কি এতো সুন্দর হয়? কিছু বুঝে ওঠার আগেই ছাতা ধরে টান। ব্রা–র বেশ কিছু সুতা ছাতার সঙ্গে উঠে এলো। মুহূর্তের মধ্যে জামার ছেড়া অংশ যার মধ্য দিয়ে অফহোয়াইট চামড়ার স্ফীত অংশ দেখা যাচ্ছে তা বোকার মতো ঢাকার চেষ্টা করলাম। একি ৩৩০০০ ভোল্টের ধাক্কা? ঠাণ্ডা বরফ যেন জ্ঞান হারালাম। জীবনে এতো নরম আর ঠাণ্ডা বস্তুতে হাত দিইনি কখনো। ছেলেমেয়েরা ঘিরে ধরলো চারদিক থেকে।

আমার কবজি হাতের মধ্যে নিয়ে শরীর ঘেষে দাড়ালো সে। অভিমানের সুরে বললো, এতোক্ষণ কোথায় ছিলে? কণ্ঠে জড়তা নেই কোনো।

আমার আত্মারাম খাচাছাড়া। গলা শুকিয়ে কাঠ। পরিস্থিতি বুঝতে পেরে একটা মরা হাসি দিলাম। কৌতূহলী ছেলেমেয়েরা চলে গেল। পাশে রাখা তার ব্যাগের ওপর আমাকে হাত টেনে বসিয়ে আমার ব্যাগ ছাড়িয়ে নিজে বসলো। কিছুক্ষণ চুপচাপ। পাশে বসা ছাত্রদের কাছে আমাদের ব্যাগ দুটো রেখে বললো, চলুন একটু সামনে যাই।

স্টেশনের পাশে একটা হোটেলে গিয়ে দুজন বসলাম। আমার নাম রিমা, রাস্তায় চলতে গেলে এতো ইমোশনাল হলে হয়? বয়কে বলে দুটো *ওরস্যালাইন* আনলো, নিজে হাতে তা গুলিয়ে একটাতে চুমুক দিতে দিতে আমি সোসিওলজি ফার্স্ট ইয়ারে। নিন স্যালাইন খেলে ভালো লাগবে।

কাচাগোল্লা এলো আমাকে তা খেতে হলো। ভাষা তার অত্যন্ত মার্জিত।

নিজেই বিল দিয়ে বললো, চলুন।

অন্যান্য পরিচয়ও হলো। সে যাবে বরিশাল। আমি কুষ্টিয়ায়। ট্রেন লেট, রাত দুটায়।

জানা গেল অনেকেই বাস রিজার্ভ করে কুষ্টিয়া যাচ্ছে। আমি বাসে দুটো সিট রেখে তাকে বলতেই রাজি হয়ে গেল। বারোটায় রওনা হলাম। পাশে বসতে আমার বেশ জড়তা।

নিজেই খুব ক্লোজ হয়ে সে বসলো। বললো, জানো, হল বন্ধ করাতে খুব ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম। তাই যা পরেছিলাম সেটাই পরে নাটোরের আপুদের সঙ্গে বিকেলে চলে এসেছি। কয়েকটা ছেলে না কিভাবে যেন তাকাচ্ছিল। খুব ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম। তোমাকে না পেলে কি যে হতো!

জানতে চাইলাম, আমাকেই বা এতো বিশ্বাসী মনে করলো, কিভাবে?

তোমার আসা দেখেই বুঝলাম, তোমার ভেতরে একটা ইনোসেন্ট ভাব আছে বলেই আমার বাম হাতটা ডান হাতের মধ্যে টেনে নিয়ে মৃদু চাপ দিল।

সাড়ে তিনটায় কুষ্টিয়া পৌছালাম। MATS-এর হস্টেলে বন্ধুর কাছে রাতটুকু কাটাবো জানালে বাকি রাত সেখানে জেগে কাটাবো শর্তে রাজি করালো।

এবার আসল বাকি ঘটনা । বন্ধু রুম ছেড়ে চলে গেল। সারা রাত গল্প করে কাটালাম। ভোরবেলা পাশে এসে গলা আলতো করে জড়িয়ে ধরে বললো, তুমি অসম্ভব সুন্দর, তোমাকে দেখলে হিংসা হয়। এগালে-সেগালে, ঠোটে বিরামহীন চুকচুক শব্দ হৃদকম্পন বেড়ে গেল। দম বন্ধ করেছিলাম।

কিছুক্ষণ পর নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে বাইরে যেতে বললো। দরজা ভিড়িয়ে দিয়ে কাপড় চেঞ্জ করতে লাগলো।

পর্দা না থাকায় জানালার কাচ দিয়ে তার উফ! নিয়ন্ত্রণ হারালাম। ভেতরে গিয়ে জাপটে ধরে নাভি থেকে কপাল পর্যন্ত অদক্ষ ঠোটে চুকচুক করে ভরিয়ে দিলাম। চোখ বন্ধ করে গাভী গরুর মতো গলা উচু করে দাড়িয়ে থরথর করে কাপছে, সে সঙ্গে আমিও। অনেকক্ষণ আমাকে জড়িয়ে ধরে রইলো। এরপর আমার বুকের ভেতর মুখ লুকিয়ে বললো, *আমার পাগল।*

স্টেশনে বরিশাল-পিরোজপুরের অনেক ছাত্রছাত্রী রাজবাড়ী হয়ে যাবে। প্ল্যাটফরমে মুখোমুখি দাড়িয়ে স্থিরভাবে দুজন দুজনার দিকে তাকিয়ে। আমাকে আড়াল করে আকাশের দিকে তাকালো। পোকা যাবার অজুহাতে কনিষ্ঠ আঙুল দিয়ে চোখের কোণা মুছলো, বুঝলাম পানি বাধ মানছে না। একটু পরে কাছ ঘেষে বাম হাত দিয়ে আমার কোমর জড়িয়ে ধরে হ্যান্ডব্যাগ থেকে তার ছাতাটা বের করলো, আমার কানের কাছে মুখ নিয়ে বললো এটা রেখে দিও, বাসর রাতে আমাকে গিফট দিও। তোমারটা আমার সঙ্গে নিয়েছি, সেইদিন তোমার আমানত তোমাকে ফেরত দেবো। তুমি সুইট, ভীষণ সুইট বলতে বলতে তার কণ্ঠ জড়িয়ে গেল।

ওড়না দিয়ে আলতো করে চোখের পানি মুছিয়ে দিলাম।

কিছুক্ষণ নীরবে কাদলো।

বাধা দিলাম না।

ট্রেন চলে গেল। প্ল্যাটফরমের খুটির গোড়ায় বসে পড়লাম। বন্ধুর স্পর্শে ধাতস্থ হলাম। মনে হচ্ছিল এতোক্ষণ স্বপ্ন নাকি কল্পনা? চলার শক্তি যেন হারিয়ে ফেললাম।

প্রায় ছয় মাস পর একটা চিঠি, সারমর্ম হলো, ডাক্তার বাবার পিএইচডি–র সুবাদে এখন স্টকহোমে। *লক্ষীটি, আমার জান, তুমি আমার জন্য অপেক্ষা করো আমার প্রতিশ্রুতি আমি রাখবো।* কোনো ঠিকানা নেই।

DHL–এর খাম।

আজ ২০০১ সাল। ১৩ বছর অতীত। কোনো খবর পাইনি। রিমা, তোমার পাগল হয়েছে ভীষণ স্মার্ট, জেলা পর্যায়ের কর্মকর্তা, হয়তো তোমার কারণেই। যে জেলাতে গিয়েছি সেখানেই সুন্দরীদের হার্টবিট হয়েছি সহকর্মীদের মতে। তোমার ছাতা নিয়ে এখনো অপেক্ষা করছি। বিয়ে করিনি। বিশ্বাস করো, পাগলের মতো ভালোবাসি তোমাকে। সোনামণি, প্লিজ! যোগাযোগ করো আগের ঠিকানাতে। আমার আত্মবিশ্বাস থেকেই বিশ্বাস করি তুমি ফিরে আসবে। অসম্ভব যদি কিছু হয়েও থাকে তাহলে বিশ্বাস করবো না। আমার ছাতাটা ফেরত দিও। এতেই তোমার স্পর্শ পাবো। অপেক্ষায় রইলাম।

কুষ্টিয়া থেকে

আবেগ

-- নীলা

একটুর জন্য বেচে গিয়েছিলাম। দারোয়ান যদি ঠিক সে সময় ছাতাটি নিতে না আসতো তাহলে আমার জীবনের সবচেয়ে বড় সর্বনাশটি সেদিন ঘটে যেতে পারতো।

আমি তখন ক্লাস নাইনের ছাত্রী। এক প্রাণচঞ্চল কিশোরী। নতুন যে কোনো বিষয়ের প্রতি এই বয়সে মানুষের আগ্রহ থাকে সর্বাধিক। যথারীতি আমিও এর ব্যতিক্রম ছিলাম না।

গুরুজনেরা যাকে বয়সের দোষ বলে থাকেন সেই দোষের ফলে আমি প্রেমে পড়ে যাই। আমার সিনিয়র ব্যাচের ক্লাস টেন–এর এক ছাত্রের সঙ্গে। নাম তার সৈকত। নাম সৈকত হলেও সে সৈকতের মতো বিশাল মনের কোনো উদার মানুষ ছিল না। অথচ এই কথাটি সে সময় অতি আবেগের কারণে বুঝতে পারিনি।

সৈকতের এসএসসি পরীক্ষা শেষ হলে সে প্রস্তাব দিল, চলো *জীবন স্বর্গ* (স্থানীয় একটি পার্কের নাম) থেকে ঘুরে আসি। আমি রাজি হলাম। বেলা এগারোটার দিকে নির্দিষ্ট স্থানে পৌছে দেখি সৈকত আগেই হাজির। তারপর দুজন মিলে রিকশা করে পার্কে গেলাম। দুপুরে গাছতলার বেঞ্চিতে বসে দুজনের মনের কথা দেয়া–নেয়া করলাম।

এই ফাকে সৈকতের এক বন্ধু যার নাম আসিফ খাবার নিয়ে হাজির হলো। আসিফকে ওই বেঞ্চে খাবার নিয়ে আসার কথা সৈকত আগেই বলে রেখেছিল। আসিফের বাড়ি পার্কের কাছেই ছিল।

তিনজন মিলে খাওয়া সেরে নিলাম। বন্ধুটি চলে গেল। এদিকে সৈকত আমার কোলে মাথা রেখে বেঞ্চিতে শুয়ে পড়লো। এরপরই শুরু হলো তার খেলা। প্রথম অবস্থায় চুমুতেই সে সীমাবদ্ধ ছিল। কিন্তু পরে সে আমার স্তনযুগল নিয়ে খেলা শুরু করলো। আমার ভেতরে তখন কি যেন ঘটে গেল। আমিও নিজেকে তার কাছে বিলিয়ে দিতে চাইলাম।

ভর দুপুর বলে পার্ক ছিল নির্জন। সেটা ছিল বৈশাখ মাস। হঠাৎ মেঘ গর্জন শুরু হলো। সৈকত আমাকে নিয়ে পার্কের মধ্যস্থিত বাংলোর পেছনে নির্জন বারান্দায় নিয়ে এলো। তখনো আমার বোধোদয় হলো না যে, কি সর্বনাশা পথে পা দিচ্ছি।

সৈকত তার নিজের এবং আমার জামা খুলে ফেললো। আমার শরীরে তখন কেবল ব্রা ও প্যান্টি আর তার শরীরে জাঙ্গিয়া। আমাকে সে বুকে তুলে নিল। আমার শরীরে তখন শিহরণ জেগে উঠলো। সে আমাকে বারান্দার ফ্লোরে শুইয়ে দিল এবং ব্রা ও প্যান্টি খুলে ফেললো। আমার পুরো নগ্ন শরীর তার চোখের সামনে। সে অবাক চোখে তাকিয়ে রইলো আমার দিকে। কি করবে ঠিক যেন বুঝতে পারছে না।

নিজের পূর্ণ নগ্ন দেহের দিকে তাকিয়ে আমিও আবেগাপ্লুত হলাম। এবার আমিই অগ্রসর হলাম। তার জাঙ্গিয়া খুলতে চাইলাম। কিন্তু সৈকত আগে আমাকে ভালোভাবে দেখতে চাইলো। সে আমার কোমল গোপন অঙ্গগুলো হাত দিয়ে নেড়ে-চেড়ে, টিপে দেখতে লাগলো। আঙুল ঢুকিয়ে দিল আমার কোমল যৌনাঙ্গের ভেতর। হঠাৎ একটা তীব্র ব্যাথা অনুভূত হলো এবং আমি অস্ফুটস্বরে শব্দ করে বসলাম। এটাই আমাকে বাচিয়ে দিল।

বৃষ্টি আসছে দেখে দারোয়ান এসেছিল বাংলোর পাশে তার খুপড়ি ঘর থেকে ছাতা নিয়ে যেতে। আমার শব্দ সে শুনে ছাতা হাতেই এদিকে এসে আমাদেরকে দেখে ফেলে। দারোয়ানকে দেখে সৈকত প্যান্ট হাতে নিয়ে দৌড়াতে শুরু করলো। দারোয়ান সৈকতকে বেশিদূর ধাওয়া না করে আবার আমার কাছে ফেরত এলো। আমি তখনো হালকা ব্যাথার ঘোরে শুয়ে আছি সেভাবেই। দারোয়ান আমাকে তার ঘরে নিয়ে বাথরুমে ফ্রেশ হতে বললো। আমি দীর্ঘ শাওয়ার নিয়ে ফ্রেশ হলাম। সেদিন দারোয়ানের পীড়াপিড়িতে তার ঘরে আমাকে সামান্য খেতেই হলো। এরপর বৃষ্টি শেষ হলে আমাকে সে রিকশা করে বাড়ির কাছ পর্যন্ত পৌছে দিয়ে গেল।

রিকশায় বসে শুনলাম আমার বয়সী তার একটা সুন্দর মেয়ে আছে। হয়তো সে আমার জন্য যা করলো তা মেয়ের কথা মনে করেই। অথবা নির্জন বাংলোয়, তার যা বয়স, সে তো আমাকে সৈকতের মতো...। না, দারোয়ানের ক্ষেত্রে আমি এ রকমটি ভাবতে চাই না।

উল্লেখ্য, দারোয়ান আমাকে সেই বিষয়টি নিয়ে কোনো প্রশ্ন করেনি। শুধু বলেছিল মা এ বয়সে আবেগে পড়ে এসব করা ঠিক নয়। আরো বড় হও, তারপর যখন জীবনকে বুঝতে শিখবে তখন প্রয়োজন হলে করো।

আজো দারোয়ানের সেই কথাটি আমার কানে ভাসে।

শ্রীপুর, গাজীপুর থেকে

ইটালিয়ান

-- খোকন

১৯৯৩ সাল। আগস্ট মাস। আমার বোনের বিয়ে। এ উপলক্ষে আমাদের দুই ভাই এবং মামাতো ভাইকে বিভিন্ন দায়িত্ব দেয়া হলো। এর মধ্যে কার্ড বিতরণ, কমিউনিটি সেন্টার ভাড়া, আত্মীয় স্বজনদের বাসায় গিয়ে বিয়ের নিমন্ত্রণ দেয়া ইত্যাদি।

আমি দায়িত্ব নিলাম কার্ড বিতরণের। কারণ মনে মনে ভাবলাম, যদি কার্ড বিতরণের দায়িত্ব নিই তাহলে অনেক বাসায় যেতে পারবো। যে কোনো বাসায় যেতে আবার আমার খুব ভালো লাগে। তাছাড়া বেশ কিছু মেয়ের সঙ্গেও সাক্ষাৎ হবে। কেননা এই বয়সে মেয়েদের সান্নিধ্য পেলে খুব ভালো লাগে। তাই এই দায়িত্ব নেয়া। আগস্ট মাসের ১১ তারিখে বিয়ে। কার্ড বিতরণ শুরু করি ৫ তারিখ থেকে।

একদিন সকাল থেকেই বৃষ্টি হচ্ছিল। তাই ভাবলাম, আজ ছাতাটা নিয়েই বের হই। বলা বাহুল্য, এই ছাতাটা আবার ইটালি থেকে আমার মামা এনেছিলেন। খুব সুন্দর দেখতে। এ ছাতা নিয়েই বেরিয়ে যাই।

ছাতাটা নিতে না চাইলেও মা জোর করে ধরিয়ে দিয়ে বললেন, জ্বর হবে, ছাতাটা নিয়ে যাও।

আমার হাতে অনেকগুলো কার্ড পলিথিনে মোড়ানো। ঢাকার বিভিন্ন স্থানে কার্ড বিতরণ করতে করতে দুপুর গড়িয়ে বিকেল। সেই ছাতাটা আমাকে দারুণ উপকার করেছে। কারণ সারাদিনই বৃষ্টি ছিল। এমপি হস্টেলে আমার এক আত্মীয়কে কার্ড দিয়ে ভাবলাম চন্দ্রিমা উদ্যানের রাস্তা দিয়ে হেটে চলে যাই। কেননা সেই রোড ভিআইপি হওয়ায় সেখান দিয়ে কোনো রিকশা চলে না। হেটে আসছি। এক

লোক গাছের নিচে দাড়ানো। সে বললো, ভাই শোনেন, আপনি কি চন্দ্রিমা উদ্যান দিয়ে গণভবনের দিকে যাচ্ছেন।

বললাম, হ্যা।

তাহলে আমাকে একটু উপকার করুন।

বললাম, কি উপকার।

আপনার ছাতার নিচে করে গণভবন পর্যন্ত যাবো। কারণ যে বৃষ্টি তাতে থামার কোনো লক্ষণ নেই। তাই এই উপকারটুকু করুন।

বললাম, আসুন।

ছাতাটা বড় ছিল। তাই দুইজনে বেশ ভালোভাবে যাচ্ছিলাম। চন্দ্রিমা উদ্যানের গাছের নিচে কিছু প্রেমিক যুগল ছাতা মাথায় দাড়িয়ে আছে।

জিয়ার মাজার সংলগ্ন রোডের কাছাকাছি আসতেই লোকটা একটা চাকু বের করে বললো, যা আছে দিয়ে যা। না হলে এখনই তোকে খুন করবো। আর চেচামেচি করবি না।

পকেটে ৭০০ টাকা ছিল আর ইটালি থেকে আনা দামি রিস্টওয়াচ নিল। নেয়ার পর বললো, যেহেতু বৃষ্টি সেহেতু ছাতাটাও দে। আর একটা কথা, প্রধানমন্ত্রীর বাসভবনের পাশে বসা পুলিশ দেখছিস, তাদের বলবি না।

বললাম, ঠিক আছে, তারপরও তাড়াতাড়ি গিয়ে পুলিশকে বলি।

পুলিশ বলে, কোথায় ছিনতাইকারী?

বললাম, ওই যে যাচ্ছে ছাতা মাথায়।

পুলিশ বললো, এতো দেরিতে বললেন কেন, কোথায় চলে গিয়েছে? তাছাড়া এই বৃষ্টির মধ্যে তাকে ধরাও যাবে না বলে তিন চারজন পুলিশ বসেই থাকলো।

নিরাশ হয়ে চলে আসি। ভেবে পাই না, আমরা কোন দেশে বাস করছি। এর বেশ কিছুদিন পর কয়েকজন বন্ধু মিলে ঢাকা স্টেডিয়ামে আবাহনীর খেলা দেখতে যাই। খেলার এক পর্যায়ে বৃষ্টি নামে। পাশে তাকাতেই দেখি পাশের একজন লোকের মাথায় সেই ছাতাটা। সেই ছাতার আলাদা বৈশিষ্ট ছিল, এ ধরনের ছাতা কখনো কারো কাছে দেখিনি। আমার বন্ধুরা ছিনতাই হওয়ার ঘটনাটা আগেই জানতো। তবুও ছাতা দেখিয়ে বললাম, ছিনতাই হওয়া ছাতাটা। তবে লোকটা ছিনতাইকারী নয়।

আমার বন্ধু বেলাল বললো, ছিনতাইকারীর সহযোগী হবে হয়তো।

আরেক বন্ধু শাহীন বললো, চল, একে ধরে পেটাই।

আমি বললাম, আগে বুঝে নিই।

লোকটার কাছে গিয়ে দুইজনে জিজ্ঞাসা করলাম, ভাই, এ ছাতাটা কোথায় পেয়েছেন?

লোকটা বললো, কেন?

বললাম, দরকার আছে।

বললো, আমি মিরপুর মুক্তিযোদ্ধা মার্কেটের সামনে থেকে ষাট টাকা দিয়ে কিনেছি।

বললাম, যার কাছ থেকে কিনেছেন তাকে চেনেন?

জি না। কেন ভাই?

সমস্ত ঘটনা বললাম।

বলার পর সে বললো, যেহেতু আপনার শখের ছাতা সেহেতু আপনি নিয়ে নিন।

লোকটি ভদ্র বলেই মনে হলো। টাকা দিতে চাইলাম, নিল না। তারপর ছাতা নিয়ে বাসায় আসি। ভাইবোন সবাই চেচিয়ে ওঠে, এই সে ছাতা।

মা এগিয়ে এসে বললেন, ছিনতাই করা জিনিস আবার ফেরত পাওয়া যায় নাকি!

বললাম, কখনো কখনো পাওয়া যায় মা।

ইসলামপুর, ঢাকা থেকে

তুচ্ছ ঘটনা

- - মোহাম্মদ সফিউল আযম সফিক

ছোটবেলা থেকে শিশির আমার বন্ধু। বিদ্যালয়ে আমরা প্রথম স্থান নিয়ে এক অঘোষিত প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হতাম। শিশির উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় মেধা তালিকায় প্রথম স্থান অধিকার করে পড়াশোনা করছে ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে।

আজ আমি এমন একটি সত্য ঘটনার কথা বলবো যা আমার বন্ধুটিকে অনেক কষ্ট দিয়েছে। এসএসসি পরীক্ষায় কৃতিত্বের সঙ্গে পাস করার পর দুজনেই একটি বেসরকারি নামকরা কলেজে ভর্তি হই। আমি বাণিজ্য বিভাগে এবং বন্ধু শিশির মানবিক বিভাগে। দুজনেই মেস ভাড়া করে কলেজের কাছাকাছি থাকতাম। একে অপরকে ছাড়া একটি মুহূর্তও থাকতে পারতাম না। যথারীতি কলেজে ক্লাস শুরু হয়ে গেল। ভালো ছাত্র হিসেবে শিশিরের নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে বেশি সময় লাগেনি। সবাই তাকে বেশ ভালো চোখেই দেখা শুরু করলো। অনেক ছেলেমেয়েরা কথা বলার চেষ্টা করেও সাহসের অভাবে

কথা বলতে পারতো না। সবার গতিবিধি বুঝতে পেরে শিশির নিজেই সবার সঙ্গে বন্ধুত্বের হাত বাড়িয়ে দেয়।

ইতিমধ্যে সকল ছাত্রছাত্রীর কাছে সে প্রিয় হয়ে ওঠে। সে সব সময় বলতো, আমি এই নীতিতে বিশ্বাসী যে, সকলের সঙ্গে বন্ধুত্ব, কারো সঙ্গে শত্রুতা নয়। কিন্তু যে মুহূর্তে সে পড়াশোনা নিয়ে ব্যস্ত ঠিক সে সময়ে একটি ছাতা এসে তার জীবন গতি মন্থর করবে কে জানতো?

একদিন বৃষ্টিতে ভিজে শিশির কলেজের প্রাকনির্বাচনী পরীক্ষা দিতে যাচ্ছিল। তার এ অবস্থা দেখে ক্লাসমেট তৃষা তার ছাতার নিচে এসে স্থান নেয়ার আহ্বান জানায়। কিছু না ভেবে শিশির তার আহ্বানে সাড়া দিয়ে কলেজে পরীক্ষা দিতে চলে যায়। তৃষা এলাকায় শান্ত হিসেবে পরিচিত। ভালো ছাত্রী হিসেবেও সবাই তাকে ভালো জানতো। এলাকার অনেক ছেলে তাকে বিভিন্নভাবে প্রেমের প্রস্তাব দিয়ে প্রত্যাখ্যাত হয়। তারপরও তারা হাল ছাড়েনি।

অবশ্য তৃষাও কারো সঙ্গে প্রেম করে না বলে এলাকার ছেলেরা তাদের প্রতিহিংসার দাবানল ছড়াতে পারে না। কলেজে আসা-যাওয়ার পথে তৃষাকে কোনো ছেলের সঙ্গে কথা বলতে কেউ দেখেনি কখনো। সেদিন শিশিরের সঙ্গে একই ছাতার নিচে দেখে সবাই একটু হতবাক হয়। তৃষার পরিবার খুবই প্রভাবশালী বলে ইচ্ছে থাকা সত্ত্বেও কেউ কিছু বলার সাহস পায়নি। পরীক্ষা শেষ হয়। শিশির প্রথম এবং তৃষা দ্বিতীয় স্থান দখল করে। পরবর্তী কালে তৃষা বিভিন্ন অজুহাতে শিশিরের কাছে নিয়মিত আসা শুরু করে। শিশির নিষেধ করা সত্ত্বেও তৃষা আসা বন্ধ করলো না, বরং আসার মাত্রাটা আরো বেড়ে গেল। ইতিমধ্যে তৃষা বিভিন্ন অজুহাতে শিশিরকে উপহার সামগ্রী দেয়া শুরু করলো।

অনিচ্ছা সত্ত্বেও শিশির সেগুলো নেয়। এরই মধ্যে শিশিরের জন্মদিন এসে গেল। তৃষা বিভিন্ন উপহার দিয়ে গেল। অনেক চিন্তা ভাবনার পর বন্ধুদের অনুরোধে সে এগুলো নেয়। তৃষার অবাধ যাতায়াতে এলাকার ছেলেরা সন্দেহ করতে লাগলো শিশিরকে। অন্যদিকে তৃষা বন্ধুত্বের দাবি জানালো শিশিরকে। সে যে কোনো সম্পর্কে সম্পর্কিত হতে চায়। শিশির সেদিন পাশ কেটে চলার চেষ্টা করে। অত্যন্ত মেধাবী শিশির হয়তো ভবিষ্যৎ সম্পর্কে কিছুটা আচ করতে পেরেছিল। কিছুদিন পর শিশিরের কাছে পাড়ার একটি ছেলে তার বন্ধুকে পাঠিয়ে জানতে চাইলো তৃষার সঙ্গে তার কিসের সম্পর্ক।

শিশির তার স্বভাবসুলভ আচরণে বন্ধুটিকে তার কথা বুঝিয়ে দেয় এবং তাদের কোনো উপকারে আসতে পারলে ধন্য হবে বলে জানিয়ে দেয়।

সামনেই আমাদের ফাইনাল পরীক্ষা। সবাই পরীক্ষা নিয়ে ব্যস্ত। শিশিরের কাছ থেকে সবাই ভালো ফলাফল আশা করে। যথারীতি পরীক্ষা শুরু হলো। ভালোভাবেই পরীক্ষা শেষ করলাম। সবচেয়ে

বিপর্যয়কর ঘটনা ঘটলো পরীক্ষা শেষ হওয়ার এক মাস পর। শিশির তার আত্মীয়ার বিয়ের উপহার কেনার জন্য মার্কেটে গেল। গিয়ে তৃষার সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়। পরস্পর কুশল বিনিময় করে।

এদিকে শিশির নিশ্চয়ই জানতো না তৃষাকে পাড়ার ছেলেরা সব সময় ফলো করতো। নির্দিষ্ট কাজ সমাপ্ত করে শিশির বাড়ি ফেরার পথে আক্রমণ করে এক দল সশস্ত্র যুবক। দৈহিকভাবে নির্যাতন করা হয় শিশিরকে। জ্ঞান হারিয়ে ফেলে। তিন দিন পর্যন্ত অজ্ঞান অবস্থায় ছিল। তুচ্ছ একটি ঘটনাকে কেন্দ্র করে সারা জীবনের সঞ্চিত সব মানসম্মান সেদিন ধুলোয় মিশিয়ে গেল। আদালত পর্যন্ত গড়ালো ঘটনাটি। নিষ্পাপ মেয়েটির কথা ভেবে শিশিরের পরিবার ঘটনাটিকে বেশি দূর নেননি। শুনেছি ছেলেরা এলাকার ত্রাস হিসেবে পরিচিত। কেউ ভয়ে কথা বলতে পারে না তাদের বিরুদ্ধে।

ঘটনার কিছুদিন পর পরীক্ষার ফলাফল বের হলো। শিশির মেধা তালিকায় প্রথম এবং তৃষা স্টার মার্কস নিয়ে উত্তীর্ণ হয়। দুজনেই ভিন্ন ইউনিভার্সিটি অধ্যয়নরত। দুজনের মধ্যে কোনো যোগাযোগ নেই। এখনো শিশির সেদিনের ঘটনার কথা মনে করে জ্ঞান হারিয়ে ফেলে। একটি ছাতা শিশিরের জীবনকে ক্ষত-বিক্ষত করে দিয়েছে।

ঢাকা ইউনিভার্সিটি থেকে

কল্যাণমুখী

-- মোহাম্মদ সাইদুর রহমান সাঈদ

সদ্য প্রাইমারি স্কুল পেরিয়ে হাই স্কুল পা দেবো, এমন অবস্থায় বাবাকে মা ধরলেন দাদার মৃত্যুকালীন ইচ্ছা অনুযায়ী আমাকে মাদ্রাসায় পড়াবেন। মায়ের অন্য যুক্তি হলো, বড় দুই ভাই স্কুলে পড়ছে। তাই ছোটটা মাদ্রাসায়।

থানা ভিত্তিক প্রাইমারি সমাপনী পরীক্ষায় ১১তম প্লেস করাতে বাবা স্কুলে পড়াতেই বেশি আগ্রহী। তাছাড়া বাবার গার্লস স্কুলের পাশেই হাই স্কুল অবস্থিত বলে সর্বদাই বাবার চোখের সামনে থাকবো এ জন্য বাবা ছাড় দিতে নারাজ।

অবশেষে মাদ্রাসায় পড়ারই সিদ্ধান্ত স্থির হলো। তবে ভর্তি হতে হলো আবার ক্লাস ফোরে। মাদ্রাসায় গিয়ে পড়ালেখায় শুরু হলো ফাকি। পরীক্ষার ১৫ দিন আগে থেকে কিছু পড়তাম। তাতেই আমার যথেষ্ট মনে হতো। কিন্তু পরীক্ষায় আশানুরূপ ফল করতে ব্যর্থ হলাম। ক্লাস রোল হলো তিন। যথাসময়ে রেজাল্ট-এর সংবাদ আব্বার কাছে পৌছে গেল। স্কুল থেকে ফিরে এসে আমাকে দেখতে

পেয়ে গর্জে উঠলেন। আমি দৌড় শুরু করলাম। বাবা তার হাতের ছাতা নিয়েই আমার পেছনে দৌড়াতে লাগলেন। এ পর্বে আমি নিশ্চিত ছাতার আঘাত থেকে বেচে গেলাম।

মে–জুন মাসের দিকে ক্লাস ফাইভের বৃত্তি পরীক্ষার রেজিস্ট্রেশনের টাকা লাগবে ১৭৫। ভাবলাম স্কুলে থাকতে লাগলো মাত্র ২৫ টাকা। অথচ মাদ্রাসায় এতো টাকা। তাছাড়া ভাতিজা সম্পর্কের এক ক্লাসমেট তাল দিল পরীক্ষা দেয়ার দরকার নেই। ইতিমধ্যে রেজিস্ট্রেশনের সময় চলে গেল। আমার এক শ্রদ্ধেয় শিক্ষক আব্বাকে জানালেন আমার কুকর্মের কথা। আব্বা সেদিন বাড়িতে গিয়ে রাতের খাবার অবস্থায় আমাকে পেলেন। কোনো কথা বলার সুযোগ পাওয়ার আগেই শুরু হলো ছাতার আঘাত। সাত আটটা মার দেবার পর মা ধরলেন এবং কি হয়েছে জানতে চাইলেন। যথারীতি মাকে বকা দেয়া শুরু হলো, তুই একে মাদ্রাসায় দিয়ে নষ্ট করেছিস।

অথচ আমি নিশ্চিত বৃত্তি পেতাম। কারণ দুজন পরীক্ষা দিয়ে দুজনই বৃত্তি পেয়েছে। এমনিভাবে ক্লাস এইটে উঠার পরও আমি বৃত্তি পরীক্ষা দিলাম না। তবে এবার ভাগ্যে আর ছাতার আঘাত জুটলো না। আব্বা বললেন, যাকে আল্লাহ মেধা দেয় সে এটার সদ্ব্যবহার না করলে আল্লাহর কাছেই জবাব দেবে।

আজ আমি মাদ্রাসা থেকে সর্বোচ্চ ডিগ্রিধারী এবং মাস্টার্স পরীক্ষার্থী। ইতিমধ্যে একটি বেসরকারি ব্যাংকে চাকরিও করছি। ভুলে গিয়েছিলাম সেই মারের কথা। যাযাদির *ছাতা* সংখ্যা মনে করে দিল সেই ছাতার বাড়ির কথা যা সন্তানদের জন্য আসলেই কল্যাণকর। উপলব্ধিটা আজ যথার্থই পীড়া দিচ্ছে।

বরিশাল থেকে

ভেজা শাড়ি

-- মোম

গণ্ডগ্রামের স্কুল থেকে এসএসসি পাসের পর মফস্বল শহরের এক কলেজে ভর্তি হলাম। পরিবারের আর্থিক অবস্থা তেমন ভালো ছিল না। তাই হস্টেলে বা মেসে থাকার আশা ত্যাগ করে লজিং নেয়ার চেষ্টা করলাম। একজন ছাত্রকে পড়ানোর বিনিময়ে দুমুঠো ভাত ও আশ্রয়ের সংস্থান হলো রত্না ভাবীর সংসারে।

রত্না ভাবীর ছোট্ট সংসার। স্বামী বাড়িতে থাকেন না। সুদূর পাহাড়ি অঞ্চলে চাকরি করেন। মাসের শেষে ঘরমুখী হন। তাদের এক ছেলে। তিন চার বছর বয়স হবে। তার লেখাপড়ার দায় আমার

ওপর। ভাবীকে ঘরকন্নার কাজে সহায়তার জন্য একজন কাজের মেয়ে আছে। এই হলো রত্না ভাবীর সংসার।

রত্না ভাবী আমার চেয়ে দুই তিন বছরের বড় হবেন। যেদিন আমার লজিং হয় সেদিন ভাবী আমার মুখোমুখি হন। তিনি ছাত্র সম্পর্কে মোটামুটি একটি ধারণা দিলেন। তারপর খোলাখুলি ভাবে বললেন, আপনি আমার ভাইয়ের মতো। নিজের বাড়ি মনে করে এখানে থাকবেন। কোনো ইতস্তত করবেন না। যখন যা দরকার বলবেন। আর হ্যা, আমাকে ভাবী বলে ডাকবেন আপনি। ঠিক আছে?

ভাবীর অকপটে বলা কথাগুলো সহজেই আমাকে আপন করে নিল।

একদিনের ঘটনা। বর্ষার সময়। *বাদলের ধারা ঝরে ঝর ঝর।* তবুও একটু আধটু বৃষ্টি থামছে। কিন্তু সন্ধ্যার পর আকাশ ঘোর অন্ধকার করে যে বৃষ্টি হচ্ছে আর থামছে না। অঝোরধারা। বৃষ্টির একটানা সুর আমার মনকে আনমনা করলো। পুরনো দিনের সব স্মৃতি মনের আকাশে ভেসে বেড়াচ্ছে। অনাগত দিনের বিভিন্ন কল্পনাও মনের মধ্যে উকিঝুকি মারছে। তবে কোনোটিই থিতু হচ্ছে না। মন যেন বিবাগী। ইচ্ছা মতো দিগবিদিক ছুটছে।

এমনি করে ভাবান্তরের লীলা যে কতোক্ষণ ধরে চলছিল তা বলতে পারবো না। হঠাৎ ক্ষিধেয় পেট মোচড় দিয়ে উঠলো। কল্পনার জগৎ থেকে বাস্তবতায় ফিরে আসি। ঘড়ির দিকে তাকাই। রাত ১১টা। আমি যে ঘরে থাকি তার থেকে অন্দরমহল একটু দূরে, বাড়ির ভেতরে। এতো রাতে এতো বৃষ্টিতে কে আমার জন্য খাবার আনবে? আর ঘরে এমন কোনো ছাতা নেই যা দিয়ে অন্দরমহলে গিয়ে একটু খোজখবর নেবো।

এমন সময় দরজায় করাঘাত হলো। ভাবলাম এতো রাতে আবার কে? হারিকেনের আলোটা একটু উসকে দিয়ে দরজা খুলি। দেখি ছাতা হাতে সাক্ষাৎ ভাবী। বৃষ্টিতে অনেকটা ভিজে গেছেন। বললাম, আপনি? এতো রাতে? অবাক করলেন!

ভাবী বললেন, অবাকের কিছু নেই। রাত অনেক হলো। আজ ভেতরের বাড়িতে খাবেন। চলেন।

ভাবীর হাত থেকে ছাতাটা নিয়ে আমরা বেরিয়ে পড়লাম।

পঙ্কিল পথ। উভয়ে পা টিপে টিপে হাটছি। লক্ষ্য করলাম ভাবী একটু দূরত্ব রেখে হাটছেন। কিন্তু বৃষ্টির ঝাপটায় ভিজে যাচ্ছেন। ভাবীকে ছাতার নিচে আসতে বললাম। ভাবী ছাতার নিচে এলেন। একই ছাতার নিচে দুইজন। পাশাপাশি হাটতে গিয়ে গা ঘেষাঘেষি হচ্ছে। ভাবীর শরীরের এক একটি স্পর্শ আমার শরীরে আগুনে হলকা ছড়িয়ে দিচ্ছে এবং মনের দুষ্ট পাখিটা ছটফট করছে। ইচ্ছা করেই বাম হাত দিয়ে তার কোমড়ে আস্তে করে চাপ দিলাম। এতে কোনো বাধা এলো না। তারপর তাকে

লতার মতো জড়িয়ে ধরলাম। তার ডান হাত আমার ডান কাধের ওপর হয়ে আমার গলাকে জড়িয়ে ধরলো। আমি আর আমার মধ্যে নেই। শুরু হলো খুনসুটি। এভাবে খুনসুটি করতে করতে আমরা কাকভেজা হয়ে প্রায় এক মিনিটের পথ পাচ মিনিটে পাড়ি দিলাম।

ভাবী ঘরের মধ্যে পৌছেই ভেজা কাপড়সহ সোজা খাটের ওপর গিয়ে শুয়ে পড়লেন। আমি ছাতাটা ঘরের এক পাশে রেখে হারিকেনের আলোতে ভাবীকে দেখতে লাগলাম। ভেজা কাপড়ের ভাজে ভাজে তার গোপন অঙ্গগুলো ফেটে পড়তে চায়। আমি আর স্থির থাকতে পারলাম না। তার দেহের ওপর ঝাপিয়ে পড়ি। এক এক করে তার ভেজা কাপড়গুলো সরিয়ে বসনমুক্ত করি। নগ্নদেহ। নিখুত অঙ্গ বিন্যাস। সুন্দর নারীদেহ। চোখ ফেরাতে পারি না এই মোহন রূপ থেকে। মন্ত্রমুগ্ধের মতো তার রূপ চেয়ে চেয়ে দেখলাম এবং স্রষ্টাকে তার অপূর্ব সৃষ্টির জন্য ধন্যবাদ জানালাম।

এক সময় আমার সমস্ত ধৈর্যের বাধ ভেঙে যায়। দুষ্ট হাতটা চঞ্চল হয়ে ওঠে। তার সুউচ্চ বুক দুটি ধরে যেই আলতোভাবে চাপ দিতে শুরু করি সেই মুহূর্তেই এক ঝটকায় আমাকে তার বুকের মধ্যে নিয়ে গেল। শুরু হলো তোলপাড়। একটা ফুরফুরে আমেজ, সুখ সুখ অনুভূতি ও পরম তৃপ্তিতে মনটা ভরে গেল।

জীবন স্রোতে ভেসে ভেসে আজ অনেকটা এগিয়েছি। কিন্তু ভাবীকে হারিয়েছি। এরপরও সেই রাত, সেই বৃষ্টি, সেই ছাতা, সেই স্মৃতি কি ভোলা যায়? ভোলা যায় না কখনো। ভাবীকে নিয়ে বড় আক্ষেপ হয়। কবি গুরুর কবিতার ঢঙে আমারও বলতে খুব ইচ্ছা হয় :

আমার হলো না সে তো
মনে তার নিত্য আসা–যাওয়া
পরনে ভেজা শাড়ি, কামনায় বিধুর।

মেঘনা থানা, কুমিল্লা থেকে

বিদ্রূপ

-- সাহিদা আক্তার মীম

১৯৯৪ সালের মাঝামাঝি। তখন আমি ক্লাস সিক্সে আর আমার ছোট বোন ক্লাস ওয়ানে পড়ে একই স্কুলে। বাবা প্রাইভেট কম্পানির একজন শ্রমিক। তিনি আমাদের সংসারের ব্যয় নির্বাহ করার পর এবং চার ভাইবোনের লেখাপড়ার খরচ চালাতে হিমশিম খেতেন। এ অবস্থায় বর্ষার দিনে স্কুলে যাওয়ার সময় ব্যাগ, ছাতার অভাবে অনেক কষ্টের শিকার হতে হতো।

একদিনের ঘটনা। আমাদের স্কুলে দশটা থেকে ক্লাস শুরু হয়। তাই দুই বোন এক সঙ্গে স্কুলে রওনা হলাম। আকাশটা বেশ গুমোট মেঘে ঢাকা ছিল। স্কুলে পৌছামাত্র বৃষ্টি শুরু হলো। দুই বোন যার যার ক্লাস রুমে ক্লাস করার পর যখন একটা বেজে উঠলো তখন আমার টিফিন পিরিয়ড আর আমার ছোট বোনের ছুটি হয়েছে। বাইরে অঝোর ধারায় বৃষ্টি হচ্ছিল। ছোট বোন বাসায় যেতে চাইলো। কিন্তু তাকে নিষেধ করলাম। কারণ ছাতা নেই, কিভাবে যাবে।

সে বললো, ছুটি হয়েছে বৃষ্টিতে ভিজে বাসায় যাবো।

এরপর তার হাতের বইগুলো রেখে দিয়ে বললাম বাসায় যেতে। কারণ বৃষ্টিতে বই ভিজে যাবে। সে তাই করলো। আর আমার ছুটি হয় বিকাল চারটায়। কিন্তু বাসায় ফেরার পথে আরো সমস্যা হলো। প্রকৃতি তখনো ঢেলে দিচ্ছিল আকাশ থেকে পানি। অনেকক্ষণ অপেক্ষা করার পর যখন বৃষ্টি থামলো না তখন বাসায় ফেরার সিদ্ধান্ত নিলাম।

ছাতা নেই, কিভাবে যাবো সেই চিন্তায় মাথা ঘুরছিল। আল্লাহর নাম পড়ে বৃষ্টির মধ্যে রওনা হওয়ার চেষ্টা করলাম। অধিক বৃষ্টির ফলে অনেক রাস্তায় পানি জমে গেছে। আর বাকি রাস্তাগুলো কাদায় পরিপূর্ণ। একদিকে আমার অনেকগুলো বই-খাতা, টিফিন-বাটি, অন্যদিকে আমার ছোট বোনের বই-খাতা। কিন্তু কি করবো! বৃষ্টির মধ্যে দুই হাত দিয়ে এতোগুলো বই খাতা ও টিফিন বাটি নিয়ে হাটা শুরু করলাম।

এদিকে রাস্তার পাশের দোকানের ছেলেগুলো নানান রকম ব্যঙ্গ বিদ্রূপ করতে লাগলো আর হাসতে লাগলো। কেউ বললো, কি আপা, খুব কষ্ট হচ্ছে। আবার কেউ বললো, আপা, আপানার ছাতা লাগবে?

তখন আমার ছোট্ট কোমল হৃদয়ে একদিকে অনেক কষ্টে পথ চলা, অন্যদিকে ছেলেগুলোর ব্যঙ্গ বিদ্রূপ শুনে ইচ্ছা করছিল তখনই মরে যেতে।

এভাবে আমার মতো আরো অনেক ছাত্রীর কষ্ট করে স্কুলে আসা-যাওয়ার পথে নানান রকম বিশ্রী পরিস্থিতির শিকার হতে হয়। ছাতাহীন স্মৃতিময় ঘটনাটি আজো আমার মনে পড়লে মনটা খারাপ হয়ে যায়।

টঙ্গী থেকে

অন্য কারো

-- সৈয়দ মনিরুল হক খোকন

১৯৯৪ সাল। নভেম্বর মাস। আমি ও আমার ভালোবাসার মানুষ কাজল দুইজনে টিএসসিতে বসে ফুচকা খাচ্ছিলাম।

ফুচকা খেতে খেতে কাজল বললো, কাল ২৩ নভেম্বর তোমার জন্মদিন। আমরা কোথায়ও বেড়াতে যাবো।

বললাম, বেশ তো, যাবো।

যেমন কথা তেমন কাজ। কিন্তু নিম্নচাপের কারণে ২২ নভেম্বর রাত থেকেই বৃষ্টি হচ্ছিল। সকালে ইউনিভার্সিটিতে গেলাম। যাওয়ার পর দেখি কাজল অপেক্ষা করছে এক গোছা গোলাপসহ। তার প্রিয় ফুলের তালিকায় গোলাপ রয়েছে শীর্ষে। কাজলের দিকে তাকাতেই থমকে যাই। অনিন্দ্য সুন্দরী লাগছিল তাকে।

আমার কাছে কাজল এসেই হাত ধরে বললো, চলো।

বললাম, এই বৃষ্টির মধ্যে?

কাজল বললো, হ্যা। গুড়ি গুড়ি বৃষ্টি এখনই ছেড়ে যাবে।

বললাম, নিম্নচাপের সৃষ্টি হয়েছে। বৃষ্টি সহজে কমবে না। একটু অপেক্ষা করো দেখি।

কিছুক্ষণ পরে দেখি বৃষ্টি কমেছে। বললাম, একটা ছাতা হলে ভালো হতো।

কাজল বললো, ছাতা হাতে নিয়ে টানাটানি ভালো লাগে না। তাই আনিনি।

রিকশা নিয়ে বোটানিকাল গার্ডেনের উদ্দেশ্যে রওনা হলাম। ইউনিভার্সিটির বাইরের কোনো পার্কে এই প্রথম আমাদের অভিসার হলো।

কাজল বললো, বেবিট্যাকসি নাও।

বললাম, তাহলে পথ তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে যাবে। তাই আজ দিনটা না হয় আস্তে আস্তে গেলাম।

রিকশায় যাচ্ছি হঠাৎ প্রচণ্ড বেগে বৃষ্টি নামতে শুরু করেছে। পর্দা দিয়ে ঢাকা আমাদের রিকশা। রিকশার মধ্যে কাজলকে জড়িয়ে ধরে বললাম, আজ তোমার জন্য এতো বৃষ্টি হচ্ছে!

কাজল বললো, কেন?

বললাম, তোমার অপরূপ রূপকে স্বাগত জানাতে। তোমার শরীরের পরশ দিতে।

কাজল আমার গালে থাপ্পড় মেরে বললো, দুষ্টু কোথাকার।

গালে হাত দিয়ে উফ বলে উঠলাম।

কাজল আমার গালে হাত দিয়ে বললো, ব্যথা পেয়েছো? আসলে এতো জোরে মারতে চাইনি।

এই ব্যথাও দূর হয়ে যায় তোমার মুখ দেখলে।

রিকশাচালক পেছন দিক তাকিয়ে বললো, *ঠিক কথা কইছেন ভাইজান। আপার যা চেহারা, দেখলে এক্কেরে পরাণডা জুড়ায়া যায়।*

রিকশাচালককে ধমক দিয়ে কাজল বললো, চুপ করো। তোমার এতো কথা কিসের শুনি?

আমরা যথাসময়ে বোটানিকাল গার্ডেনের গেটে পৌছে যাই। এদিকে বৃষ্টি কমার কোনো লক্ষণ না দেখে বললাম, চলো বাসায় চলে যাই।

সে বললো, এতোটা পথ পেরিয়ে এসেছি, এখন চলে যাবো?

বললাম, বৃষ্টিতে ভিজলে তোমার শরীর খারাপ হবে। আর তোমার শরীর খারাপ হোক এটা আমি চাই না।

কাজল বললো, উপায় একটা আছে।

বললাম, কি উপায়?

এই যে এই দোকানে একটা ছাতা দেখছো, এটা আমরা চেয়ে নিয়ে আসি চলো।

বললাম, তুমি এখানে দাড়াও, আমি দেখছি।

মধ্য বয়স্ক একজন দোকানি। তার কাছে মিথ্যা করে বললাম, ইউনিভার্সিটি থেকে এসেছি কয়েকটা গাছ সম্বন্ধে জানতে। বোটানির ছাত্র তো, তাই। দয়া করে যদি ছাতাটা কিছু সময়ের জন্য দিতেন তাহলে খুব উপহার হতো।

লোকটি বললো, আপনার উপকার হবে ঠিকই তবে আমার ক্ষতি হবে।

বললাম, কেন?

আপনি যদি ছাতা নিয়ে আর ফিরে না আসেন।

ভেবে দেখলাম, কথাটা ঠিকই বলেছে। তাই পকেট থেকে তার হাতে একশ টাকার একটা নোট ধরিয়ে দিয়ে বললাম, এই নিন একশ টাকা জমা। ছাতা ফেরত দেয়ার পর টাকা নেবো।

ঠিক আছে, নেন। তবে খেয়াল রাখবেন, নষ্ট যেন না হয়।

ছাতা নিয়ে দুইজনে গার্ডেনে প্রবেশ করলাম। এই বৃষ্টির মধ্যে কিছু স্কুল-কলেজ পলাতক ছেলেমেয়ে। কারো সঙ্গে ছাতা আবার কেউ কেউ বৃষ্টিতে ভিজছে। আমরা দুইজনে একটা গাছের নিচে চলে গেলাম। ছাতার ওপর গাছের পানি টুপ টুপ করে ঝরে পড়ছে। কাজলের মুখের কাছে মুখ নিয়ে বললাম, আজ তোমাকে অপূর্ব লাগছে।

কাজল বললো, এই দুষ্টু, মুখ আর কাছে আনবে না।

বৃষ্টি পড়ছে বলে মাথা ছাতার নিচে আনলাম।

কাজল আমার হাত ধরে বললো, আমাকে কখনো ভুলে যাবে নাতো?

বললাম, না, না। জীবন চলে যাবে তবুও তোমাকে ভুলবো না। তাকে বললাম, তোমার বুকে হাত দিয়ে দেখবো তুমি আমাকে ভালোবাসো কি না?

সে তার হাতে আমার হাত নিয়ে বুকে চেপে ধরলো।

তার বুকের ধুক ধুক শব্দ আলাদাভাবে শুনতে পেলাম।

সত্যি তুমি আমাকে ভালোবাসো। বললাম আমি।

কাজলের বাধা থাকা সত্ত্বেও তার ঠোটে চুমু দিই। আমার ঠোটে লাগা তার ঠোটের লিপস্টিক তার রুমাল দিয়ে মুছে দেয়।

কাজল বললো, চলো চলে যাই।

বললাম, ঠিক আছে, চলো।

ছাতার নিচে দুইজন অন্তরঙ্গভাবে আসছিলাম। কাজল বললো, দাড়াও।

দাড়ালাম।

কাজল আমার ঠোটে বেশ কয়েকটা চুমু দিয়ে বললো, এটা তোমার জন্মদিনের উপহার।

বললাম, তুমি পৃথিবীর সেরা উপহার দিলে।

দোকানিকে বললাম, আপনার ছাতাটা বহু উপকার করেছে। তাই একশ টাকা থেকে কিছু টাকা রেখে দিন। নিতে চাইলো না। তবুও ২০ টাকা জোর করে দিলাম।

ছাতা এবং লোকটার উপকারের কথা আজো মনে পড়ে। কাজল এর বেশ কিছুদিন পর তার বাবা মায়ের সঙ্গে সুইজারল্যান্ড চলে যায়। সে এখন সুইজারল্যান্ডের নাগরিক। প্রথমে কয়েক বছর চিঠি দিয়েছিল। অনেক দিন যোগাযোগ নেই। হয়তো অন্য কারো ভালোবাসা পেয়েছে।

আজো সকাল থেকে অবিরাম বৃষ্টি হচ্ছে। তবে কাজল পাশে নেই। সে এখন সুইজারল্যান্ডের মেয়ে। বারান্দায় দাড়িয়ে দাড়িয়ে বৃষ্টি দেখছিলাম। হঠাৎ মনে হলো কাজলের কথা। কাজল হয়তো সুইজারল্যান্ডের কোনো পার্কে ছাতার নিচে দাড়িয়ে অন্য কোনো ছেলের হাত ধরে বলছে, আমাকে কখনো ভুলে যাবে নাতো?

মাদারীপুর থেকে

আশ্রয়

-- খালেকুজ্জামান বিপুল

ছোটবেলা থেকেই যখন ছাতার সঙ্গে পরিচিত ঠিক তখন থেকেই ছাতা হারানোর জন্য প্রায়ই মায়ের বকা খেতাম, এর কারণ হচ্ছে, স্কুলে যাবার প্রস্তুতির সময় যখন কখনো বৃষ্টি হতো মা তখন সঙ্গে ছাতা দিয়ে দিতেন। কিন্তু ফেরার সময় ছাতা আনতে মোটেও মনে থাকতো না। যেহেতু বাইরে তখন বৃষ্টি হতো না সেহেতু ছাতার প্রয়োজন অনুভব করতাম না বলে মনেও থাকতো না। তাই তো মায়ের বকুনি খেতে হতো।

তখন এসএসসি টেস্ট পরীক্ষা দিচ্ছি। আমার এক বন্ধু নাম শিমুল পরীক্ষা শেষ হওয়ার প্রায় ১৫ মিনিট আগে পরীক্ষা শেষ করেই খাতা জমা দিয়ে চলে গেল। নির্ধারিত সময়েই পরীক্ষা শেষ করলাম। বারান্দাতে দাড়াতেই দেখি বাইরে প্রচণ্ড বৃষ্টি হচ্ছে। হঠাৎ দেখি শিমুল একটি বেশ বড় ছাতা নিয়ে স্কুলের বারান্দায় উঠে এসেছে। ভাবলাম যাক শেয়ার করে তার সঙ্গে যাওয়া যাবে। তাছাড়া বন্ধুটির বাড়িও আমাদের বাড়ির পাশেই।

তার সঙ্গে শেয়ার করার প্রস্তাব করতেই বন্ধুটি বললো, তাজনীনকে শেয়ার করার জন্যই তার এই ক্ষুদ্র চেষ্টা।

বললাম, ছেলেমানুষী রাখো, বাড়িতে চলো।

সে আমার কথায় কর্ণপাত না করে ছাতাটি নিয়ে বেশ কয়েকবার তাজনীনের সামনে দিয়ে আসা–যাওয়া করলো এ আশাতেই যদি সে তার ছাতার নিচে আশ্রয় দিয়ে নিরাপদে বাড়ি পৌছে দেয়ার প্রস্তাব করে। কিন্তু না, তাজনীন সে প্রস্তাব করেনি। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে তাজনীনরা প্রায় তিন চারজন বান্ধবী মিলে বৃষ্টিতে ভিজেই বাড়িতে যাওয়ার প্রস্তুতি নিল।

শিমুল বুঝতে পেরেই কাছে এসে ছাতাটি আমার হাতে ধরিয়ে দিয়ে বললো, তুই ছাতাটি নিয়ে চলে যা।

তাহলে তুই!

জিজ্ঞাসা করতেই সে বললো, আমি ভিজে যাবো। তাজনীন ভিজে যাবে, আমিও ভিজে যাবো। বলেই ছাতাটি রেখে চলে গেল।

ছাতা মাথায় দিয়ে হাটতে হাটতে ভাবতে লাগলাম, একটি মেয়েকে একটি ছেলে একতরফাভাবে প্রচণ্ড ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশগুলো বান্ধবীটিকে বোঝাতে চেষ্টা করলো। কিন্তু কিছুতেই মেয়েটি বুঝতে চাইতো না। এই যে ছাতার ব্যাপারটি এটাও তো আমার সেই বন্ধুটির ভালোবাসার এক বহিঃপ্রকাশ। কিন্তু তাজনীন আমার বন্ধু শিমুলের সেই ছাতার নিচে নিরাপদ অনুভব করলো না, জীবনসঙ্গী হিসেবে তার সেই জীবন ছাতার নিচে নিজেকে জড়িয়ে নিল না।

সম্পর্ক স্থাপনের প্রচণ্ড চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়ে অবশেষে শিমুল কানাডা–য় পাড়ি জমালো। পাচটি বছর পর যখন দেশে ফিরে এলো, কোনো এক সুযোগে যখন তাদের দেখা হলো তখন তাজনীন অতীতের ব্যাপারগুলোর জন্য দুঃখ প্রকাশ করে তার সঙ্গে জীবনকে জড়ানোর জন্য কিছুটা ইঙ্গিত দিতে চেষ্টা করলো। তবে তখন আর শিমুলের অতীতের দিকে তাকানোর মোটেও সময় নেই।

দুই.

আমি যখন ইউনিভার্সিটিতে পড়ছি আমার বান্ধবীটি তখন কলেজে পড়ছে। হঠাৎ আমাদের দুজনের ইচ্ছে হলো নৌকা ভ্রমণে বের হবো। বুড়িগঙ্গা থেকে নৌকা ভ্রমণে বের হলাম। মাঝির মাথায় ছাতা, আমাদের মাথার উপর ছাউনি নদীর মাঝামাঝি এনে নৌকাটি থামিয়ে দিল। মাঝিটির জন্য ডিস্টার্বড অনুভব করছিলাম। নদীর ওপর শুধু আমাদের দুজনেরই ভেসে থাকার ইচ্ছে হলো। কিছুক্ষণ পরই মাঝি তার ছাতাটি নামিয়ে আমাদের ঢেকে দিল।

এ ব্যাপারে যে তার বেশ অভিজ্ঞতা তা বুঝতে বিন্দুমাত্র অসুবিধা হলো না। পানির ওপর ভেসে আছি আমরা দুজন। ভালোবাসার কথা বলছি, হৃদয়ের কাছাকাছি চলে এসেছি। অন্তরঙ্গ টান অনুভব করছি যেন দুজন দুজনার ভালোবাসার নিরাপদ নিঃস্বার্থ, নির্ভেজাল আশ্রয় খুজে পেয়েছি, পেয়েছি জীবনসঙ্গী হিসেবে জীবন ছাতার নিচে সারাটা জীবন কাটিয়ে দেয়ার অনন্ত বাসনা।

ইটালি থেকে

জুটি

-- সুমিত বড়ুয়া রিপন

আজ ২৮ আষাঢ়। নূরীর সঙ্গে পরিচয়ের প্রথম দিন। ঠিক এমনি দিনে একটি বছরকে পেছনে ফেলে এই সময়ে আমরা একজন আরেকজনকে চিনতে শিখেছিলাম। নূরীর কি সে কথা মনে আছে? হয়তো আছে হয়তো নেই। কিন্তু ছাতাটা এখনো আমি সযত্নে তুলে রেখেছি শেলফে রাখা বইয়ের মতো করে। কারণ সেটার কাছে আমি যে ঋণী। পারতপক্ষে আমরা দুজন ছাড়া এ ছাতার স্পর্শ কাউকে পেতে দিই না। ধরতেও দিয় না কাউকে যাতে প্রেমের ভিকটিম নষ্ট না হয়।

আজ আমাদের প্রথম প্রেমের গৌরবোজ্জ্বল এক বছর পূর্তি উৎসব। সেই সব সুখ স্মৃতির নষ্টালজিয়ায় পেয়ে বসেছে আজ আমাকে।

সেদিন দুপুরটা ছিল কুকুর বিড়ালের ছোটাছুটি। প্রচণ্ড বিদ্যুৎ চমকানো শব্দ আর টিনের ওপর রিনিঝিনি বৃষ্টি পতনের সুর। ভালোই লাগছিল। কিন্তু বাধ সাধে তার কমতি না দেখে। যদিও ছাতা একটা ছিলই। তবে ছাতার সাধ্য কি সমুদ্র সাতার। সে এক প্রলয়ঙ্করী আকাশ বাতাস কাপানো বৃষ্টি। বাসা থেকে বেরিয়ে ছিলাম মাথার ওপর টাটকা রোদ নিয়ে। এখন দোকানের এই পাটাতনে বসে দেখতে হচ্ছে মেঘের কুয়াশা। এমন কোনো দোকান নেই সেখানে মানুষের পায়ের স্পর্শ পড়েনি। তিল ধারণের ক্ষমতাও নেই কোথাও। চা দোকানের এই ভেতরকার চেহারাও করুণ। যতো না কাস্টমার তার চেয়ে ঢের জনতার ঢল। সবাই সেই বাধভাঙা বৃষ্টি থেকে বাচতে চায়।

আমার পাশের টেবিলে বসা একদল প্রবীণ জনতা, তারা খোশগল্পে মশগুল। ভ্রুক্ষেপ নেই অন্য কোথাও। কেবল তারা রাজনীতির আলোচনায় গুষ্ঠি উদ্ধারে ব্যস্ত। এই ভর দুপুরের ঘোর অমানিশা অন্ধকারেও হঠাৎ হঠাৎ বিজলির ঝলকানিতে জনতার সকরুণ মুখগুলো স্পষ্ট হয় যারা মাথা গোজার আশ্রয়ের খোজে দাড়ায় দোকানের ঢেড়ায়, যাত্রী ছাউনির তলায় আর বট বৃক্ষের নিচে। ঠিক তখনি উল্টোদিক থেকে একটা একটি মেয়ে বৃষ্টির ছাট গায়ে মেখে ফুটপাথ দিয়ে হেটে যেতে দেখা যায়। মেয়েটি কতো অসহায়, মাথা গোজার আশ্রয়স্থলও তার জন্য কোথাও বরাদ্দ নেই। কেবল পুরুষ ঠাসা সবখানে, কি নিদারুণ কষ্ট মেয়েটির। বৃষ্টিতে ভিজে তার সালোয়ার, কামিজ, একে একে লেপটে যাচ্ছে শরীরের সঙ্গে। লেপটে থাকা জামা একবার টেনে তোলে তো জামা আরো নিবিড় করে আকড়ে ধরে তার শরীরকে। এবং এর সুযোগে নেয় কতোগুলো লালায়িত পুরুষের চোখ।

আমি এগিয়ে গেলাম ছাতা হাতে। যে শুকনো ভদ্রতা বোধগুলো আমার অস্তিত্বে ক্রমেই ভোতা হয়ে যাচ্ছিল সেটা আরো জ্বালিয়ে দিল। পেছন থেকে শুনলাম, হয়তো মেয়েটিও শুনেছে, রাজনীতির তুবড়ি ফোটানো প্রবীণদের কয়েকজন গলা বাড়িয়েই বলছেন, *ফুটানি মারার জায়গা পাচ্ছে না পোলা, ঝড়-বাদলের দিনে*

ছাতা ছাড়া বের হলো কেন এ মেয়ে? আরে বেক্কল, নিজে বাচলে বাপের নাম। বেটা, ভাবলাম, মেয়েটি কি করে একটু দেখি? তা না তিনি হচ্ছেন খলিফা হারুন-অর-রশিদ। হারামজাদা।

তারপর চারধারে আকাশ কাপানো অট্টহাসির রোল। একজন লোকও নেই তার প্রতিবাদ করে। তাদের হয়তো মনেও থাকে না বাসায় এর মতো এমন একটি মেয়ে তারও আছে কিংবা থাকতে পারতো। ছিঃ পুরুষ জাতি, ছিঃ। মেয়েটির সামনে আমার মাথা কতোটা নিচু হয়ে গেল।

আমি বললাম, চলুন, আপনাকে বাসায় পৌছে দিই।

মেয়েটি ধরা গলায় অভিমানী স্বরে বললো, থাক, ঢের শিক্ষা হয়েছে। তার আর দরকার হবে না।

কিন্তু আমি নাছোড়। বললাম, চলুন তো, কে কি বলেছে তার হিসাব করার সময় এখন নয়।

এরপর পথ চলতে চলতে কতো যে কথা, কতো আলাপ। সেই প্রথম একটি সম্পূর্ণ অপরিচিত নারীর শরীরের স্পর্শ পেলাম। খুব কাছ থেকে অনুভব করলাম মেয়েলি শরীরের ঘ্রাণ। ছোট ছাতার ভেতর আর কতোই বা দূরত্ব বজায় রাখা যায়। তাই শরীরে শরীরে এই অনৈতিক ঠোকাঠুকি। বুঝলাম সে খুব সহজ, সরল ও কোমলমতি একটি মেয়ে। এবং আশ্চর্যের বিষয় হলো, লোকে যে আগুন রাঙা সুন্দরী বলে সে হলো ঠিক তেমন যা প্রথম দেখায় মাথায় আসেনি। বৃষ্টিতে ভিজে জব জব হয়ে গিয়েছিলাম দুজনেই।

বাসার গেট পর্যন্ত পৌছে দিতেই কথার সমাপ্তি টেনে সে বললো, চলুন, এক কাপ চা খাবেন।

প্রতিউত্তরে বললাম, না, আরেকদিন। চায়ের অফারটা জমা রইলো।

এরপর ঠিক কিভাবে জানি না গাঢ় হতে থাকে পরিচয়। গাঢ় থেকে গাঢ়তায় পৌছে এবং ভালোলাগা থেকে ভালোবাসায়। এখন আমরা হলাম জুটি। একে অপরের শরীরের দাগগুলো অবলীলায় চোখ বেধে বলে দিতে পারি কোথায়, কেমন, কতো দাগ আছে কার, কার শরীরের উষ্ণতা কতো বেশি।

রাঙ্গুনিয়া, চট্টগ্রাম থেকে

ঢাল

-- মোহসিন ভুঞা

ছেলেবেলায় দেখেছি কোনো বিশেষ নিমন্ত্রণ অথবা অনুষ্ঠান উপলক্ষে মুরুব্বি শ্রেণীর লোকেরা কাধে চাদর আর হাতে ছাতা নিয়ে অনেকটা আয়েশি ভঙ্গিতে রওনা হতেন। ছাতা শুধু যে রোদ বৃষ্টির কারণে ব্যবহৃত হয় সেটা বোধ করি ঠিক নয়। শৌখিনতা অথবা কোনো কোনো ক্ষেত্রে মর্যাদার বিষয় হয়ে দাড়ায়। রাজা–জমিদারদের আমলে প্রজারা নাকি ছাতা মাথায় ধরে তাদের সীমানার চারপাশে পা রাখতে পারতো না। এখনকার রাষ্ট্রপতি–প্রধানমন্ত্রীদের সেই ইচ্ছা না থাকলেও স্থলপথ, জলপথ ও আকাশপথ যেদিক দিয়ে তারা যান না কেন সেদিকে নিরীহ জনসাধারণকে মূর্তির মতো থামিয়ে দেয়া হয়।

যাহোক, ছাতার গতানুগতিক ব্যবহারকে বাদ দিলে আর কি কোনোভাবে এর প্রয়োজন আছে? সে কথায় আসছি।

আমার নানা প্রতিদিন ফজরের নামাজের সময় হাতে একটা ছাতা নিয়ে মসজিদে যেতেন। এর সঙ্গে বৃষ্টির কোনো সম্পর্ক ছিল না আর রোদের তো প্রশ্নই আসে না। কৌতূহলবশত একদিন জিজ্ঞাসা করাতেই তিনি বললেন, আরে মূর্খ, রাস্তায় কতো বেওয়ারিশ কুকুর আছে জানিস?

হাসি সংবরণ করে তাকে বললাম, তাহলে ছড়ি নিলেই পারেন।

তিনি ততোধিক ক্রোধের সঙ্গে জবাব দিয়েছেন। বেকুব, আমি কি বুড়ো?

নানা বোধহয় বয়স আড়াল করার জন্য ছড়ির পরিবর্তে ছাতা নেয়ার পক্ষপাতী ছিলেন।

কিন্তু ছাতার অভিনব ব্যবহারের কথা শুনে অবাক হয়েছি। আমাদের বাসায় ভাড়া থাকতেন এক দূরসম্পর্কের ভাই। তার স্ত্রীর হাসির সঙ্গে বজ্রপাতের দুর্লভ মিল আছে। একদিন ভাবীর সেই কল্পিত হাসি শুনে গিয়ে দেখি ভাই মাথা নিচু করে বসে আছে আর ভাবী নৃত্যের সব কয়টা মুদ্রাযোগে হেসে চলেছেন।

আমার অনেক পীড়াপীড়ির পর যেটুকু উদ্ধার করতে পারলাম সেটা হচ্ছে, হরতালের কারণে ভাবীর নিষেধ সত্ত্বেও ভাই অফিসে গিয়েছিলেন এক বিশেষ ব্যবস্থায়। ভাই মনে করেছিলেন, ছাতা মাথায় দিয়ে গুটি গুটি পায়ে অফিসে গেলে পথে পিকেটাররা বয়স্ক লোক অথবা রোগী ভেবে ছেড়ে দেবে। কিন্তু বিধি বাম। পিজি হাসপাতালের কাছে আসার পর কে যেন চেচিয়ে বললো, এই ছাতিওয়ালারে ধর।

এই কথা শোনার পর আমাদের সেই ভাই কোনো রকমে ছাতা ফেলে দে ছুট। কিন্তু দুষ্ট পিকেটাররা তাকে পিছু নিয়ে একেবারে তার কর্মস্থল পাবলিক লাইব্রেরি পর্যন্ত নিয়ে যায়। ভয়ে বেচারা অফিস করা তো দূরের কথা, গ্লাসের পর গ্লাস পানি খেয়ে কোনো রকমে সময় কাটিয়েছেন।

আমাদের দেশে যেভাবে হরতাল চেপে আছে তাতে ছাতা দিয়ে কি আর মাথা বাচানো যাবে! যারা দেশের মাথা তাদের মাথায় তো চিরস্থায়ী ছাতা ধরা। ইওরোপে একটা কথা প্রচলিত আছে – *এখানকার নারী আর আবহাওয়ার কোনো স্থিরতা নেই।* তাই সচেতন সকলের কাছে ছাতা আবশ্যকীয়ভাবে ব্যাগে থাকে।

একদিন ঝলমলে রোদেলা শীতের দিনে এক বৃদ্ধাকে ছাতা মাথায় হেটে যেতে দেখে মনে হলে ভদ্রমহিলা বোধহয় চোখে কম দেখেন। তাই কাছাকাছি হতে বললাম, কি সুন্দর দিন আজ। আপনি তো ইচ্ছা করলে ছাতা বন্ধ করে যেতে পারেন।

তার মুখ থেকে জবাব পাওয়ার আগেই যে বিল্ডিংয়ের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলাম তার ছাদ থেকে একরাশ বরফ এসে আমার মাথায় পড়লো। আমার অবস্থা দেখে বৃদ্ধা মহিলা মুচকি হেসে চলে গেলেন। আমি তার ছাতা নয়, ঢালের দিকে তাকিয়ে রইলাম।

ভিয়েনা থেকে

মজার খেলা

-- মুন্সী বেইজো

পেয়ালা থেকে দুটো ডিম নিজের প্লেটে তুলে নিয়ে এক চোখে হাসেন ভাইয়া। বলেন, আমার চোখ নষ্ট। তাই আমার জন্য দুটো ডিম। আমি ফ্যাল ফ্যাল করে বোকার মতো তাকিয়ে থাকি নির্বাক। ভয়ে তাকাতে পারি না ডিমের দিকে। অথচ নিজের ভাগের ডিম হারানোর শোকটাও মনে মধ্যে তখন তুমুল। গুরু অপরাদের লঘু শাস্তি হিসেবে চুপ থাকা ছাড়া কিছুই করার ছিল না। না হলে দেখিয়ে দিতাম!

বাবার ছোট ছেলে হিসেবে আবদারগুলো অন্যায় না হয়ে প্রশ্রয়ের মধ্যেই থাকতো সব সময়। বিলেত ফেরত চাচার হাতের ফোল্ডিং ছাতাটির দিকে চোখ পড়ে যায়। তাই বাবার কাছে আবদার আমারও একটা চাই ওই রকম ছাতা চাই। চাচারটা পাওয়ার লোভে সব সময় তার পিছু পিছু ঘুরতাম। চাওয়ার সাহস পেতাম না। মাঝে মাঝে সকলের অগোচরে হাত বুলিয়ে নিতাম ছাতাটায়। চাচা চলে গেলেন লন্ডন। কিন্তু ছাতাটি আর আমার পাওয়া হলো না। বাবার কাছে, মায়ের কাছে অবিরাম *ছাতা চাই, ছাতা চাই* আন্দোলন। অবশেষে নমনীয় কর্তৃপক্ষ পৃন্টেড চাইল্ড আমব্রেলা মঞ্জুর করলেন। এবং তাতেই সন্তুষ্ট হয়ে প্রবল আনন্দে তাকে ২৪ ঘণ্টার সঙ্গী করে নিলাম।

বাড়ির পাশের মাঠে বিকেলে আমার ভাইয়ারা ও চাচাতো ভাইয়েরা কাবাডি, ফুটবল খেলতো। সেদিনও সবাই মিলে কাবাডি খেলায় ব্যস্ত ছিল। আর ছিলাম একটি রঙিন ছাতার মালিক অন্যসব ছোটদের ঈর্ষার পাত্র হয়ে। খেলার বিরতি চলছিল এমন সময় একটু জোরে বাতাস বইতে শুরু করলে আমার মেজভাইয়া এসে ছাতাটি চাইলেন। ছাতা দিতে অস্বীকার করলাম। তিনি বললেন, একটি মজার খেলা দেখাবেন। খেলা দেখার লোভে আমি তার হাতে ছাতা দিলাম। এবং ছাতা বন্ধ করে বাতাসের বিপরীত দিকে ভাইয়া সজোরে ঘোরাতেই ছাতাটি খুলে যায়। আমি অবাক এবং খুশিও। ভাইয়ার কাছ থেকে ছাতা নিয়ে মাঠের একপাশে বাতাসের সাহায্যে ছাতা খেলার প্র্যাকটিস করতে থাকি। অনেক চেষ্টার পর আমিও বাতাসের সাহায্যে ছাতা খুলতে শিখলাম।

আমার আয়ত্তে করা বিদ্যার পরীক্ষা দেখাতে ভাইয়াদের খেলার মাঠে চলে এলাম। মেজভাইয়াকে দেখতে বলেই আমি হঠাৎ ছাতাটি সজোরে ঘোরলাম। ঘোরানোর সঙ্গে সঙ্গেই একটি বিকট চিৎকার শুনতে পেলাম। চেয়ে দেখি চিৎকার আর কারোর না আমার ছোটভাইয়ার। সে এক চোখ চেপে ধরে তারস্বরে চিৎকার করে চলছে এবং তার হাতের ফাক গড়িয়ে রক্ত পড়ছে। তখনো ঘটনা ঠিক কি হয়েছে আমি বুঝতে পারিনি। হতবাক হয়ে ছাতা হাতে নিয়ে দাড়িয়ে রইলাম। দেখছিলাম ছোটভাইয়াকে সবাই ধরাধরি করে ঘরে নিয়ে যাচ্ছে। এক চাচাতো ভাইকে দেখলাম সবেগে সাইকেল চালিয়ে ডাক্তার আঙ্কলকে ডাকতে যেতে। সবাই আমার দিকে কেমন করে তাকাতে লাগলো। আমি কিছু বুঝতে না পেরে মায়ের কোলের কাছে গিয়ে দাড়ালাম। ছোটভাইয়া চোখ গেল, চোখ গেল, বলে চিৎকার করে কাদছে। এবং আমাকে মেরে ফেলার হুমকি দিচ্ছে। তখন এটুকু বুঝতে পারলাম তার চোখের আঘাতের পেছনে আমি জড়িত।

আমি তখন তার আক্রোশ থেকে বাচার জন্য ছাতা ফেলে মায়ের কোলে ওঠে বসলাম। আর মা এক হাতে আমাকে কোলে নিয়ে খাটের পাশে বসে অন্য হাতে ছোটভাইয়ার মাথায় হাত বোলাচ্ছেন। ইতিমধ্যে আমাদের চাচা সম্পর্কিত ডাক্তার এসে পড়েছেন। তিনি সব শুনে ভাইয়ার চোখে ওষুধ দিয়ে ব্যান্ডেজ করে দিয়েছেন। এবং বাম চোখে ব্যান্ডেজ নিয়ে ছোট ভাইয়া দুই মাস শুয়ে বসে কাটালেন। মা যখন ডাক্তার আঙ্কলকে বলছিলেন তখন আমি শুনলাম। কিভাবে আমার ছাতার কোণা গিয়ে ভাইয়ার চোখে আঘাত করেছিল। আমি যখন ছাতা ঘোরাছিলাম তখন ভাইয়া আমার পেছনে দাড়ানো ছিলেন। এবং তখনই ছাতার কোণা গিয়ে তার বাম চোখের শাদা অংশে ঢুকে যায়। তারপর দুই মাস ছোটভাইয়ার অনরবত খোচা এবং জুলুম সহ্য করেছি। কারণ তার চোখের ব্যান্ডেজ-এর দিকে তাকালেই বুকটা ধক করে উঠতো। তাছাড়া এই প্রথম একটি বড় ধরনের দুর্ঘটনার নায়ক হয়েও শাস্তি পাইনি। অথচ মনে মনে প্রস্তুত ছিলাম কখন ঝড় আসে?

লালমোহন, ভোলা থেকে

বিভ্রাট

-- কাজী শীপু

আমার আব্বা তখন মাগুরার জেলা হেড পোস্টমাস্টার। খুবই সহজ-সরল এবং আপনভোলা লোক। বাজারে গেলে কিংবা দোকানে চা নাশতা খেতে গেলে প্রায়ই ছাতা ভুলে রেখে আসতেন। এবং এই ছাতা হারানো বিড়ম্বনার জন্য মা প্রায়ই রাগের ভাষায় অনুযোগ জানাতেন যে, দোকান থেকে উঠে আসার সময় নিজেকে একটু খেয়াল করে ছাতাটা নিয়ে আসার কথা স্মরণ করাতে এতো ভুল কেন

হবে? আব্বার এই ভুলোমনের কারণে এমনো মাস গেছে যে, মাসে আমাদের দুই তিনটা ছাতাও কিনতে হয়েছে।

আব্বা সাধারণত বন্ধ ছাতাটা ঘাড়ে কিংবা বাম হাতের বাহুতে নিয়ে চলতেন। এ রকমই এক বিকেলে আব্বা বাসায় এসে হাসতে হাসতে মাকে বললেন, দেখো, আজ আর হাটের এতো মানুষের ভিড়েও ছাতা ভুলে রেখে আসিনি। কিন্তু মা–সহ আমরা সবাই অবাক হয়ে দেখতে পেলাম যে, আব্বা তো ভুল করেননি। উপরন্তু অন্য কারো সর্বনাশ করার কর্মটা করে এসেছেন। কারণ আমার পিতাজির বাম হাতের বাহুতে তো তার নিজের ছাতাটা আছেই, সেই সঙ্গে আব্বার ঘাড়েও একটা রঙিন ছাতা ঝোলানো রয়েছে স্বাস্থ্য কর্মীদের সেই সবুজ ছাতা। আমরা সবাই আব্বার ভুলোমনের চূড়ান্ত দেখে হাসি আটকে রাখতে পারছি না। আব্বা খুব লজ্জা পেলেন। আমাদের হাসি দেখে এবং তার বোকামির জন্য। আমরাও লজ্জা পেলাম আব্বাকে লজ্জায় ফেলার জন্য।

আব্বার এবার দুশ্চিন্তা শুরু হলো। কিভাবে প্রকৃত মালিকের কাছে ছাতাটা পৌছে দেয়া যায়। হাটের ভেতর তো কতো চেনাজানা মানুষের সঙ্গেই কথা হয়েছে। কতো দোকানেই যেতে হয়েছে সওদা কেনার জন্য। কিন্তু কোথা হতে কোন সময়ে যে, এই সবুজ ছাতাটা আব্বার ঘাড়ে উঠে এসেছে তা তিনি একটুও স্মরণে আনতে পারছেন না। আব্বা কষ্ট পেতে শুরু করলেন, সেই সঙ্গে আমরাও।

ঘটনার পরদিন আমাদের বাসায় অপরিচিত এক ভদ্রলোক এলেন। নিজের পরিচয় দিয়ে জানালেন যে, এই সবুজ ছাতাটা তার। হাটের ভেতরে তিনি এবং আব্বা যখন একই দোকান থেকে সওদা কিনছিলেন তখন ফিরে আসার সময় আব্বা মনের ভুলে এই ভদ্রলোকটির ছাতাটাও নিজের ঘাড়ে তুলে নেন ওনার সামনেই। ভদ্রলোকটি তো অবাক। চোখের সামনে ছাতা ছিনতাই। কিন্তু একটু পরেই তার ভুল ভাঙলো। কারণ তিনি দেখলেন যে, আমার আব্বার বাম হাতেও নিজের ছাতাটা ধরা রয়েছে। আব্বা ঘাড়ে ও হাতে দুইটা ছাতা নিয়ে হেটে আসছেন এই দৃশ্য দেখে সেই ভদ্রলোক যা বোঝার বুঝে নিয়েছেন এবং সারা পথ হাসতে হাসতে আব্বাকে ফলো করেছেন। অন্যরাও যারা এই দুই ছাতা বহনের দৃশ্যটা দেখেছেন তারাও আব্বার পেছনে হেসেছেন। হাটতে হাটতে আব্বা যখন পোস্ট অফিসের সীমানায় প্রবেশ করেছেন তখন সবুজ ছাতার মালিক নিজের ছাতাটা লজ্জায় আব্বার কাছে চাইতে পারেননি। তাহলে হয়তো আব্বা খুব লজ্জা পেতে পারতেন এই ভেবে। একটা দিন অতিক্রান্ত হওয়ার পর তিনি এসেছেন যেন আব্বা ধাতস্থ হওয়ার সুযোগ পান।

তারপর আর কি! ভদ্রলোকের মহানুভবতায় আমরা খুব কৃতজ্ঞ হলাম। ওনাকে নাশতা খাইয়ে সবুজ ছাতাটা ফিরিয়ে দিয়ে আমরা ধন্য হলাম এবং ওনাকেও ধন্য করলাম।

প্রায়শ্চিত্ত

-- রূপক

আমি তখন উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা। প্রথম কর্মস্থল। যোগদানের প্রথম মাস। পরিদর্শনে গেলাম উপজেলা সদরের একটি সরকারি প্রাইমারি স্কুলে।

পরিদর্শনের অভিজ্ঞতা এই প্রথম। স্কুলের ছাত্রছাত্রী ৬৫০জন। মোট শিক্ষক শিক্ষিকা নয়জন। প্রধান শিক্ষিকা স্মার্ট, খুব সুন্দরী না হলেও অত্যন্ত আকর্ষণীয়। পরিদর্শনে আমাকে তিনি বেশ সহযোগিতা করলেন।

প্রায় ত্রিশ চল্লিশ মিনিট কেটে গেল স্কুলে। এবার অফিসে ফেরার পালা। কাছে রিকশাও নেই। হঠাৎ বৃষ্টি এলো। এখন উপায়? আরো প্রায় ৩০ মিনিট নষ্ট হলো। অস্থির হলাম অফিসে ফেরার জন্য।

স্যার আমার ছাতা নিয়ে যান। স্কুল থেকে ফেরার পথে আমি অফিস থেকে নিয়ে আসবো।

দ্বিধা, সঙ্কোচ, ইতস্ততায় প্রধান শিক্ষিকার দিকে তাকালাম।

তিনি মিষ্টি হাসলেন। হাত বাড়িয়ে দিলেন।

আমি পৌছে গেলাম অফিসে। বৃষ্টি থেমে গেল। আজ অফিসে কাজ কম। লোকজনের ভিড় নেই। একাকী নিঃসঙ্গতায় মনে পড়ছে অনেক কিছু। এভাবে কেটে গেল কিছুক্ষণ। দুপুরের খাবার সারতে বাসায় রওনা দেবো এমন সময় অফিসে এলেন সেই ছাতার মালিক। মুখে সেই হাসি।

জিজ্ঞাসা করলাম, স্কুল ছুটি?

বললেন, না, টিফিন পিরিয়ড।

ছাতা নিতে এসেছেন?

না, আচ্ছা আসি।

বসতে বলবো কি বলবো না দ্বিধা-দ্বন্দ্বে কিছুই বলা হলো না। চলে গেলেন। অবশেষে পিওনকে দিয়ে ছাতা পাঠালাম। বললাম যেন দেখা করেন।

জবাবে তিনি পিওনকে বললেন, স্যার যেন বাসায় বেড়াতে আসেন।

সেদিন বিকেলেই তার বাসা *হেলেন ভিলায়* গিয়েছিলাম। চা-নাশতা, গল্পে কেটে গেল অনেকক্ষণ। আবার এলো বৃষ্টি। আমি দুশ্চিন্তায় পড়লাম।

তিনি মৃদু হেসে বললেন, অসুবিধা কি? ছাতা নিয়ে যাবেন।

আমারও হাসি পেল। বললাম, না, বৃষ্টি থাকবে না। সত্যি সত্যি কিছুক্ষণ পরে বৃষ্টি গেল থেমে। রুমে ফিরলাম রাত আটটায়। রাতে তাকে নিয়ে, চাকরি নিয়ে, জীবন নিয়ে ভাবলাম অনেক কিছু। তিনি বিবাহিতা, আমি এখনো বিয়ে করিনি।

এরপর অনেকবার তিনি অফিসে এসেছেন। আমিও গিয়েছি তার বাসায়। আজ তার থেকে অনেক দূরে।

বদলি হয়ে না এলে হয়তো কোনোদিন জানা হতো না তিনি আমাকে কতোটা ভালোবাসেন। গত দুই বছরে কয়েকশ চিঠি লিখেছেন। জবাব দিয়েছি আমিও। আপনি থেকে তুমি, হৃদয়, প্রিয়, প্রিয়া কতো কি! তাকে ভুলতে চাই। কিন্তু এমন নিঃস্বার্থ, অকৃত্রিম, অবুঝ ভালোবাসাকে ভুলে যাবার কৌশল আমার জানা নেই। তাই সিদ্ধান্ত নিয়েছি, সারা জীবন প্রায়শ্চিত্ত করে যাবো।

ঢাকা থেকে

পাচ মিনিট

- - মুহম্মদ নোমান হোসেন

আজকাল প্রায়ই নব্বই–এর গণআন্দোলনের কথা মনে পড়ে। দেশবাসী কি প্রবল বিশ্বাসে ঝাপিয়ে পড়েছিল সেদিন। তাদের মাথার ওপরে ছিল আমাদের সমস্ত রাজনীতিবিদ, বুদ্ধিজীবীসহ সমাজের অন্য শীর্ষ লোকদের নিশ্চিন্ত আশ্বাস। *বিশ্ব বেহায়ার খপ্পর থেকে দেশ বাচাও* আখ্যানটাই বড় হয়ে উঠেছিল। আমরা সেভেনে পড়ুয়া একদল ছেলেও এলাকার বড়ভাই কাকাদের সঙ্গে জনগণের সে মিছিলে অংশ নিয়েছি। আমরা অবশ্য তেমন কিছু না বুঝেই গিয়েছি। আমরা আগের প্রজন্মের লোকদের দেখেছি নির্ভরতার প্রতীক হিসেবে, ছাতা হিসেবে।

আমাদের রাজনীতিবিদ বুদ্ধিজীবী এবং অন্য পেশাজীবীদের এ মিলিত ঐক্য অসহায় দেশ আর এর গরিব, দুঃখী জনগণের জন্য ছাতার মতো একটা দারুণ নির্ভর আশ্রয়স্থল রূপে বিবেচিত হয়েছিল। পরে বুঝেছি এ ঐক্যটা ছিল সাময়িক।

একবার আমার ছাতার একটি শিক ভেঙে গেল। প্রৌঢ় এক ছাতা মেরামতকারীর কাছে পরম বিশ্বাসে এর দায়িত্ব দিয়েছিলাম। লোকটি বিশ টাকার বিনিময়ে ছাতাটি ঠিক করেছিল আরেকটি ভাঙা শিক দিয়ে। বিশ টাকায় আমি পেয়েছিলাম পাচ মিনিট স্থায়ীত্বের ভালো ছাতা। তারপর আগের অবস্থায়। দেশ মেরামতকারী লোকেরা আমাদের হারানো ছাতাটিকে দেখে উচ্ছ্বসিত আর বিষণ্ণ হয়েছে। কিন্তু

আমি জানি, আমাদের জাতিরও সত্যিই কোনো ছাতা নেই। তাহলে আমরা মাথা তুলে দাড়াবো কিভাবে?

এসব নিয়ে আমি হয়তো বা অনেকেই অনর্থক ভাবি। মাঝে মাঝে ঘুমের ব্যত্যয় ঘটাই। আজকাল প্রায়ই অসহায় মনে হয় নিজেকে। ছাতার অনুপস্থিতিতে আসন্ন বিপদে উটপাখির কৌশলকে আজকাল এ জন্য যথার্থ বলে মনে করি।

পাচগাও, চাদপুর থেকে

নিরাপদ

- - শাহরিন সোনিয়া

আমার আব্বুর একটা অভ্যাস সব সময় যেখানেই থাকেন না কেন, ছাতা নিয়ে যাবেন। অফিসে কিংবা অন্য যে কোনো জায়গায় গেলেই তিনি ছাতা নিয়ে যান। গ্রীষ্ম, বর্ষা যে কালই হোক না কেন। আব্বুর এই ব্যাপারটা আমার কাছে এতো বিরক্তিকর লাগে যে কি বলবো! এ জন্য আমি সাধারণত আব্বুর সঙ্গে কোথাও যেতে চাই না। কারণ ভালোভাবে ড্রেসআপ গেটআপের পর আব্বুর সঙ্গে যদি বের হই তখনো তার হাতে ছাতা থাকে। তাও যদি ছোটখাটো ছাতা হতো তাহলেও একটা কথা ছিল। কিন্তু না, তিনি সব সময় বড়, কালো, লম্বা বাটওয়ালা ছাতা সঙ্গে রাখেন। আর সমস্ত স্মার্টনেসটাই যেন নষ্ট হয়ে যায়। আব্বু নিজেও ভালো ড্রেসআপের পরও বিরাট একটা কালো ছাতা হাতে নেবেন। উফ! মেজাজটা যা গরম হয়!

ওনার ভাষ্য এরূপ – কখন বৃষ্টি হয় বলা তো যায় না। বাংলাদেশের যা আবহাওয়া। সকালে যদি ঝলমলে রোদ দেখো তো খানিকবাদেই নামবে বৃষ্টি। এই বৃষ্টির হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্যই তো এ ছাতা।

আব্বুর এই কথাগুলো শুনলে আরো বেশি রাগ লাগে। আবার হাসিও পায়। কারণ আব্বু কথাগুলো এমনভাবে বলেন যে, না হেসে পারা যায় না। ছাতা নেন বলে ওনার সঙ্গে এ জন্য কোথাও যেতে চাই না। মাঝে মাঝে যদি স্কুল কিংবা কোচিং বা অন্য কোথাও আব্বুর সঙ্গে যাই তাহলে আগেই বলে রাখি যে, তুমি কিন্তু ছাতা নিতে পারবে না।

একবার ক্লাস ফোরে পড়ার সময় ক্লাসের এক মেয়ে আমাকে বলেছিল, আচ্ছা সোনিয়া, তোমার আব্বু সব সময় সঙ্গে ছাতা রাখেন কেন?

এই কথা শোনার পর আমি বাসায় এসে আব্বুর ওপর কি যে বিরক্ত হয়েছিলাম তা এখনো মনে আছে।

আমার আম্মু আবার বলেন, কেন, ছাতা সঙ্গে রাখলে অসুবিধা কি?

২০০০ সালের ঘটনা। আম্মু আব্বু একদিন আমার খালার বাসায় গেলেন। তখনো আব্বু ছাতা নিয়ে গেলেন। বাসায় ফেরার পর আম্মুকে বললাম, ছিঃ আম্মু, এভাবে আব্বু যে ছাতা নিয়ে তোমার সঙ্গে গেলেন, তোমার কি একটু খারাপও লাগলো না?

এ কথা শুনে আম্মু আবার বললেন, খারাপ লাগার কি আছে?

আম্মুর এই কথা শুনে তো আমি হতবাক। আম্মুও যে এ রকম ছাতাপ্রেমী হয়ে উঠবেন তা আমার কল্পনায়ও ছিল না।

যাই হোক। আম্মুও একটা ছাতা কিনে ফেললেন। ছাতাটা নিয়ে বর্ষাকালে আম্মু অফিসে যেতেন। তবে সেটা অবশ্যই আব্বুর ছাতার মতো কালো। কিন্তু বড় না।

এ বছরের প্রথম দিকে ছাতাটা নষ্ট হয়ে গেল। ছাতাটা নষ্ট হওয়াতে মনে মনে খুশিই হলাম যে, আম্মু হয়তো আর ছাতা সে কিনবেন না। কিন্তু না, আম্মু ছাতাটা ঠিক করালেন এবং এখনো বৃষ্টি হলে সেটা নিয়ে বের হন।

আমার এক মামা আছেন। তিনি অবিবাহিত। আব্বু মাঝে মাঝে মামাকে বলেন, তোমার বিয়ের সময় আমাকে অবশ্যই একটা ছাতা দেয়া লাগবে।

মামাও ঠাট্টা করে বলেন, হ্যা, হ্যা। আপনি হবেন ঘটক আর ছাতা পাবেন না, তা কি হয়?

ছাতাপ্রেমীদের সঙ্গে বাস করলেও আমি এখনো ছাতা পছন্দ করি না। এতে একটু কষ্ট করে এবং একটু না হয় ভিজেই যাবো তবুও ছাতা নেবো না। বাবা–মা যেমন ছাতার আশ্রয়ে নিরাপদ বোধ করেন, আমরাও বাবা–মায়ের ছত্রছায়ায় নিরাপদে আছি।

মগবাজার, ঢাকা থেকে

প্রাপ্তি স্বীকার

- - জিএসএম গাউছুজ্জামান রুমান

ফাস্ট ফুডের দোকান খুলেছি কয়েক মাস যাবৎ।এ কয়েক মাসে দোকানে একে একে বহু মূল্যবান জিনিস খুজে পেয়েছি। যেমন জনৈক ভদ্রলোক একবার আমার দোকানে পাচ হাজার টাকার একটি

বান্ডিল ফেলে যান। পরে মাইকে ঘোষণা দিয়ে টাকার প্রকৃত মালিককে খুজে বের করলাম। এছাড়া ছোটখাটো আরো অনেক ঘটনা আছে।

তবে আমার দোকানে ছাতা জমা হওয়ার ঘটনাটি খুবই মজার। একদিন লক্ষ্য করলাম, দোকানের সামনের দরজাটির একপাশে একটি ছাতা পড়ে আছে। তবে ছাতাটি সম্পূর্ণই অপরিচিত মনে হলো। আশপাশের লোকজনকে জিজ্ঞাসা করলাম কেউ ছাতা রেখে গেছে কি না। সবাই না সূচক মাথা নাড়ালো। নিয়মিত কাস্টমার যারা আছে তারাও বলছে ছাতা হারায়নি। এরই মধ্যে আমার খালাতো বোন রুবা অনুমান করে বললো বিকেজিসি গার্লস স্কুলের মেয়েরা যেহেতু তোমার দোকানে নিয়মিত ফুড বা আইসকৃম নিতে আসে তাদের কেউ সম্ভবত ছাতাটা ফেলে গেছে।

ধারণা অনুযায়ী স্কুল ফেরত মেয়েদের জিজ্ঞাসা করলাম। মেয়েরা জানালো তাদের কেউ ছাতা হারায়নি। এভাবে ক্রমেই দোকানে আসা প্রত্যেকটি মেয়েকে জিজ্ঞাসা করা হলো। না, তাদের কেউ ছাতা হারায়নি। বার বার একই প্রশ্নে বিচলিত হয়ে স্কুলের মেয়েরা শেষ পর্যন্ত কমিটমেন্ট করলো, ঠিক আছে, স্কুলে খোজ নিয়ে দেখবো কেউ দোকানে এসে ছাতা রেখে গেছে কি না? কিন্তু এই প্রতিশ্রুতি নিয়ে যখন ছাতার মালিককে খুজে বের করতে ব্যর্থ হবে তখন তারা এসে আমাকে কি জবাব দেবে? কাজেই মেয়েরা এখন দোকানেই আসা ছেড়ে দিয়েছে।

হিতে বিপরীত দেখে বাধ্য হয়ে মেয়েরা যখন রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিল তখন ডাক দিয়ে কাছে এনে বললাম, ঠিক আছে, তোমাদের আর কষ্ট করতে হবে না। আমার দায়িত্ব আমিই পালন করবো।

কিন্তু একি কাণ্ড! এ কয়দিনে যে আরো কয়টি ছাতা দোকানে জমা হয়েছে। শেষ পর্যন্ত কি আর করা। *এখানে কয়েকটা ছাতা পাওয়া গেছে, উপযুক্ত প্রমাণ গ্রহণপূর্বক ফেরত দেয়া হবে।* সাইনবোর্ড ঝুলিয়ে দিলাম।

হবিগঞ্জ থেকে

জীবন কাহিনী

- - মোস্তফা আনোয়ার

আমাদের বাসায় ছাতা মেরামত করতে আসা সোবহান মিয়ার সঙ্গে কথা হয়। কথা প্রসঙ্গে তিনি বলেন, বেকার অবস্থায় আসামের এক লোকের কাছ থেকে শখের বশে ছাতা মেরামত করার কাজ শিখি। পরে জীবিকার তাগিদে সেটি শখ থেকে পেশায় পরিণত হয়। আজ দীর্ঘ ৩০ বছর ধরে ছাতা ঠিক করে আসছি। আমার হাত ধরে একমাত্র ছেলে সেও এই পেশায় এসেছে। প্রতিদিন বাপ-বেটা

মিলে একশ দেড়শ টাকার মতো রোজগার করি যা দিয়ে আমার পাচ সদস্যের পরিবারের ভরণ–পোষণ কোনো রকমে চলে যায়।

সোবহান মিয়ার কাছ থেকে জেনে অবাক হলাম যে, আগের দিন ছাতার বাটগুলো ছিল বাশের। চিকন বাশের মধ্যে বালু ঢুকিয়ে আগুনে পুড়িয়ে তাপের সাহায্য তা বাকা করা হতো। অবশ্য এখনো চট্টগ্রামের কাজিরহাট, বিবিরহাট প্রভৃতি অঞ্চলের আদিবাসীদের মধ্যে বাশের হাতলওয়ালা ছাতার প্রচলন রয়েছে। তবে প্রায় সর্বত্রই দিনবদলের সঙ্গে সঙ্গে পুরনো মডেলের ছাতার স্থানগুলো নতুন মডেলের দখলে চলে যাচ্ছে।

আমাদের ছাতা ঠিক করার ফাকে ফাকে সোবহান মিয়া জানালেন, আগে শ্রীমঙ্গলের চারপাশে ঘিরে থাকা উদনা, বরমা, বিদ্যাবিল, কালীঘাট প্রভৃতি চা বাগানে ঘুরে ঘুরে ছাতা মেরামতের কাজ করতেন। এখন বয়স হয়ে যাওয়ায় তিনি আগের মতো পরিশ্রম করতে পারেন না। তাই স্থায়ী আবাস গড়েছেন শ্রীমঙ্গলের নতুন বাজারে। তবে মাঝে মধ্যে মন চাইলে শহরের এদিক–সেদিক বের হন।

সোবহান মিয়া আরো জানালেন, শ্রীমঙ্গল বৃষ্টির জায়গা। তবুও এখানে বর্ষাকাল ছাড়া অন্য সময়ে ছাতা ঠিক করার পেশাটি মন্দা। তাই ছাতার কাজের পাশাপাশি টর্চ লাইটও মেরামত করেন।

প্রথম জীবনে সোবহান মিয়া দশ টাকা, সাড়ে দশ টাকা দামের ছাতা বিক্রি করেছেন। তার নিজের বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ছাতার দামও বেড়েছে বলে জানালেন। লন্ডন, আমেরিকা, কানাডা প্রভৃতি দেশের ছাতা মেরামতের অভিজ্ঞতা রয়েছে সোবহান মিয়ার। সেই অভিজ্ঞতার ঝুলি থেকে তিনি বললেন, বাংলাদেশের ছাতাগুলো মজুবত বেশি। অন্যান্য দেশের ছাতা হালকা। তাই তা বহন করায় অনেক সুবিধা।

সোবহান মিয়ার নিজেরও ৬৫ টাকা দামের একটি ছাতা আছে যেটি তিনি ছাতার খুচরা যন্ত্রাংশ কিনে নিজেই বানিয়েছেন। তার পরিবারের কোনো ছাতা আছে কি না এ প্রশ্নের জবাবে তিনি মাথা নেড়ে না সূচক জবাব দিলেন।

আসলে সোবহান মিয়ার পরিবারে কোনো ছাতা নেই। তিনি তার গোটা পরিবারকে ছাতার মতো ছায়া দিচ্ছেন।

স্টেশন রোড, শ্রীমঙ্গল থেকে